চাঁদমামা

নভেম্বর ১৯৭৩

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন শুভজিত কুণ্ড

এডিট করেছেন সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com

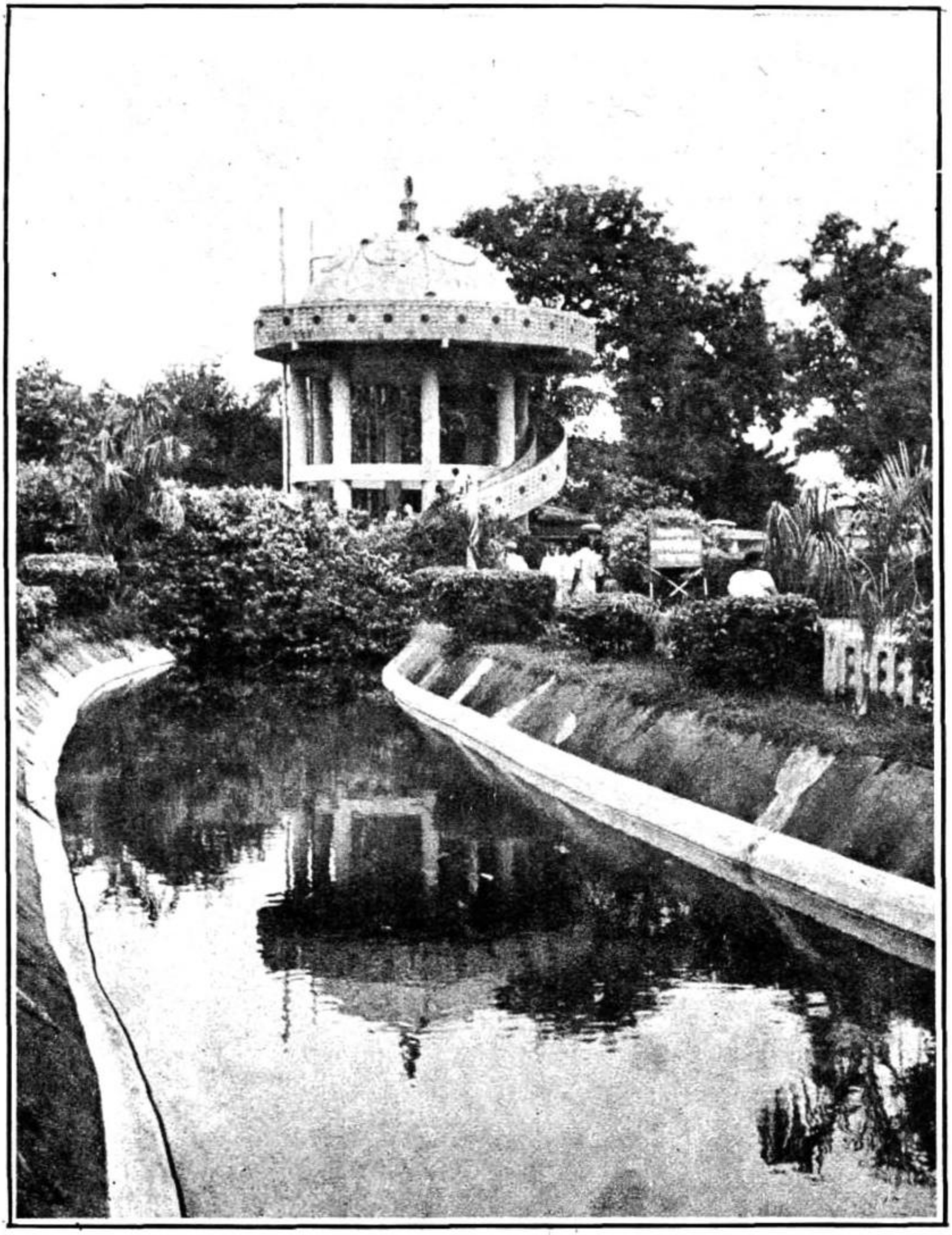

Photo by: **SAMBHU MUKHERJEE**

পেটের গোলমাল?
সে আবার কি বাপু?
কোনদিন শুনিনিতো!
ডাবর
গ্রাইপ
ওয়াটার
প্রত্যেক মায়ের কাছে
তার শিশুর মতন প্রিয়
শিশুদের বদহজম, অম্বল,
পেটব্যাথা, বায়ু, ও দাঁত উঠার
সময় ব্যাথার
একটি সুস্বাদু
সুনিশ্চিত
সমাধান
GRIPE
WATER
ডাবর (ডাঃ এস. কে. বর্ম্মন) প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-২৯

মজা করে জমাতে চাও?
ডোনাল্ড ডাক্‌কে
সঙ্গে নাও!

খুব সহজ ও চমৎকার উপায়ে
জমানোর অভ্যাস গড়ে তুলতে আপনার
ছেলেমেয়েকে সাহায্য করুন।
চার্টার্ড ব্যাঙ্কের যে কোন শাখায়
চলে আসুন ও মাত্র ৫ টাকা দিয়ে
আপনার ছেলেমেয়ের জন্য একটা
ডিস্‌নে ক্যারেক্‌টার এ্যাকাউন্ট
খুলে দিন। প্রতিটি ডিস্‌নে ক্যারেক্‌টার
এ্যাকাউন্টের সাথে বিনামূল্যে দেওয়া
ডোনাল্ড ডাক্‌ মানি বাক্সে জমাতে
শিশুরা বড় মজা পায়।

দি চার্টার্ড ব্যাঙ্ক

—সেরা যেখানে হিসাবনিকাশের অঙ্গ

ভারতে ব্রাঞ্চসকল — অমৃতসর, বোম্বাই, কলিকাতা, কালিকট, কোচিন, দিল্লী, কানপুর, মাদ্রাজ, নয়াদিল্লী ও ভাস্কো দা গামা।

SEKAI/CB/B/540

এই চায়ের জনপ্রিয়তা দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে আপনাদের চাহিদাতেই

লিপটনের রুবি ডাস্ট

লিপটনের রুবি ডাস্ট চা রাতারাতি লোকের মন জয় করলো কেমন করে—বলুন তো ? এর মূলে কিন্তু আপনারাই। কেননা, আপনারা চান এমন চা—যার প্রতি প্যাকেটে পাওয়া যাবে ঢের বেশি কাপ চা, গাঢ় লিকার আর মনমাতানো স্বাদগন্ধ।

লিপটন বাংলাদেশের জন্য চা
(LIPTON)

একমাত্র প্যাকেটের চা-ই থাকে তরতাজা, থাকে স্বাদেগন্ধে ভরপুর

প্রতি প্যাকেটে পাবেন ঢের বেশি কাপ চা
তাই এর কদর দিন দিন বেড়েই চলেছে

LRDC-8/73 BEN

everpsl/508b/PP BN

চাঁদমামা

সংস্থাপক : বি. নাগি রেড্ডি
নিয়ন্ত্রণ : চক্রপাণি

এবারের বেতাল কথা 'বিজয় সিংহ'-এর বিষয়বস্তু ছুই রাজকুমারের নির্বাচন কৌশল। আর চিহ্নটাই যেন সব। প্রজাদের এই মান দেখে ছুঃখে অভিমানে দেশ ভাগ করে রাজা চলে গেলেন মঠে। 'সাধনা' কাহিনীতে দেখা যাবে কিভাবে মুক্তোর খোঁজ করতে করতে স্ত্রী পুত্র পরিবার হারালো এক সওদাগর। আবার হাজার হাজার মুক্তো অন্যের হাতে দিয়ে সে হতে চাইল এক খাঁটি বৈরাগী। এক চারণ কবি 'অপমাণের বদলা' নিল ছুই রাজার মধ্যে যুদ্ধ লাগিয়ে।

খণ্ড ২ নভেম্বর ১৯৭৩ সংখ্যা ৫

অমর বাণী

নক্রঃ স্বস্থাণ মাক্রাম্য গজেন্দ্র মপি কর্ষতিঃ
স এব প্রচ্যুত স্থানাৎ শুন্যাপি পরিভূয়তে ॥ ১ ॥

[কুমির নিজের জায়গায়—জলে—থেকে হাতীকেও টেনে নিতে পারে কিন্তু নিজের স্থান ত্যাগ করে—বাইরে—একটা কুকুরের কাছেও পরাজিত হয়।]

নীচাশ্রয়ো ন কর্তব্যঃ কর্তব্যো মহদাশ্রয়ঃ
ঈশাশ্রয়ো মহানাগঃ পপ্রচ্ছ গরুড়ং সুখম্। ॥ ২ ॥

[নীচ ব্যক্তিদের আশ্রয়ে যাওয়া উচিত নয়। বড়দের আশ্রয়ে যাওয়া উচিত। কথিত আছে ঈশ্বরের আশ্রয়ে থাকার পর মহাসর্প গরুড়কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "ভাল আছ তো?"]

য়াত্যেকতোস্ত শিখরং পতিরোষধীণাম্
আবিষ্কৃতোরুণ পুরস্‌সর একতোর্কঃ
তেজদ্বয়স্য যুগপদ্বয়সনো দয়াভ্যাম্ (কালিদাস) ॥ ৩ ॥

[আর এক (পূর্ণিমা) চাঁদের অস্ত হচ্ছে। অন্যদিকে অরুণের সাথে সূর্যের উদয় হচ্ছে। এক মহান ব্যক্তির পতনের সঙ্গে সঙ্গে অন্য এক মহান ব্যক্তির আবির্ভাব যেন জগৎ সংসারের অমোঘ নিয়ম।]

সংসারের নিয়ম

সুন্দর স্বপ্ন

এক গ্রামে শ্রীদেবী নামে এক মহিলা ছিলেন। তাঁর ছিল দুই ছেলে। বড় ছেলের নাম রাম আর ছোটর নাম শ্যাম। শ্যামের বাঁ পা দুর্বল ছিল তাই তাকে লাঠির সাহায্যে হাঁটতে হত। শ্রীদেবীর একটা দুশ্চিন্তা ছিল ছোট ছেলেকে নিয়ে। কি করে রোজগার করবে, কি করে খাবে!

চিন্তা রোগ বড় রোগ। শেষে শ্রীদেবী শয্যাশায়ী হলেন। একদিন বড় ছেলে রামকে ডেকে বললেন, "বাবা, শ্যামকে দেখা-শোনার ভার তোমার উপরেই দিয়ে যাচ্ছি। জানিনা তুমি তাকে কিভাবে দেখবে।"

মার কান্না সহ্য করতে পারল না রাম। সে বলল, "আমি কথা দিচ্ছি মা, আমি তাকে ভাল ভাবে রাখব। কোন কিছুর অভাব হবে না তার।" ছেলের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পেয়ে শ্রীদেবী শান্তিতে প্রাণ-ত্যাগ করলেন।

দুই ভাইয়ের রান্না করে খাওয়ানোর কেউ ছিল না। প্রতিবেশীদের পরামর্শে বড় ভাই রাম বিয়ে করল কণকলতাকে।

কয়েকদিন পরেই কণকলতা শ্যামকে দেখেই রেগে যেত। কথায় কথায় খাওয়ার খোঁটা দিত। "বড় ভাই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করে আর ছোট ভাই বসে বসে খাবে।" আরও অনেক কথা শ্যাম প্রায়ই শুনত। কিন্তু সে কিছু বলত না।

একদিন অনেক কথার পর কণকলতা শ্যামকে বলল, "সারাদিন ঘরে বসে কুকুরের মত খেতে লজ্জাও করে না।"

শ্যাম মনে মনে কাঁদতে লাগল। জগতে তাকে সান্ত্বনা দেবার কেউ নেই। বউদি

নিরাপদ চক্রবর্তী

তাকে যা খেতে দিত তাতে তার পেট ভরত না। দুঃখের আর বেদনার স্মৃতি বুকে চেপে রেখে একদিন শ্যাম বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

টানা চার দিন লতা পাতা যা হোক খেয়ে চার দিনের মাথায় শ্যাম রাজধানী পৌঁছাল। রাত হয়ে গেছে। তাই সে একজনের বাড়ির সামনে ঘুমিয়ে পড়ল।

গভীর রাত্রে সে এক স্বপ্ন দেখল। স্বপ্নে দেখতে পেল তার পা ঠিক হয়ে গেছে। সে খোঁড়া নয়। তার প্রচুর ধন-সম্পত্তি আছে। তার বাড়িতে চারটে চোর ঢুকেছে। ছোরা দেখিয়ে শ্যামকে ভয় দেখাচ্ছে ওরা। ভয়ে আতঙ্কে শ্যাম চিৎকার করে উঠল, "চোর! চোর!"

নিজের চিৎকারে নিজেই জেগে গেল। তার চিৎকারের সময় পাশের এক জমিদার বাড়িতে চোর ঢুকেছিল। সেই চোরের ধারণা হল তাকে দেখেই কেউ চিৎকার করছে। চোর ঘাবড়ে গেল। এদিকে শ্যামের চিৎকার শুনে অনেকের ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। জমিদার বাড়ির লোকগুলোও উঠে পড়ল। চোর ধরা পড়ল। এহেন চোর ধরার ব্যাপারে সাহায্য করায় জমিদার বাড়ির লোকজন শ্যামকে রাজদরবারে নিয়ে গেল। চোরকেও তারা দরবারে নিয়ে গেল। ওরা শ্যামকে দেখিয়ে রাজাকে বলল, "মহা-রাজ, এই লোকটাই চোর ধরতে সাহায্য করেছে। বেচারা খোঁড়া। তাই হয়ত ছুটে গিয়ে ধরতে পারেনি চোরকে। তবে এ না চেঁচালে কিছুতেই চোর ধরা পড়ত না।

শ্যামের কাছ থেকে সমস্ত বিষয় জানতে পেরে রাজা রাম ও কণকলতাকে ডেকে পাঠালেন। শ্যামের প্রতি দুর্ব্যবহার করার জন্য কণকলতাকে ধমক দিলেন। শ্যামকে পুরস্কার দিলেন। তারপর রাজার নির্দেশে রাম, শ্যাম ও কণকলতা এক সঙ্গে থাকতে লাগল। আর চোর পেল কঠোর শাস্তি।

যক্ষপর্বত

ষোল

[সুড়ঙ্গ দুর্গে ঢুকে নেকড়েদের দেখে গুরু-ভালুকের অনুচররা ভয়ে কাঁপতে লাগল। খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত সুড়ঙ্গে ঢুকে বৃকেশ্বরী দেবীর পিছন থেকে গুরু-ভালুককে বনে চলে যেতে বলল। গুরু-ভালুক বনে চলে গেল। তাকে ধাওয়া করল নেকড়েগুলো। তারপর···।]

গুরু-ভালুকের আর্তনাদ ও নেকড়েদের গর্জন শুনে খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত, সমরবাহু ও চন্দু তাড়াতাড়ি সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এল। ওরা সামনেই দেখতে পেল ভালুক জাতের কয়েকজন লোক বনের দিকে ছুটছে। তার পেছনে ছুটছে গুরু-ভালুক। আর সবার শেষে ছুটছে নেকড়ে।

খড়্গবর্মা এই দৃশ্য দেখে বলল, "একটা ব্যাপার আমার খুব আশ্চর্য লাগছে। বৃকেশ্বরী দেবীর এত ভক্ত গোটা কয়েক নেকড়ের ভয়ে এভাবে ছুটে পালাচ্ছে।"

তোমার আশ্চর্য লাগুক অথবা হাসি পাক, ওদের যখন নেকড়েগুলো ছিঁড়ে খাবে তখন সেই দৃশ্য দেখা আমাদের বোধহয় উচিত হবে না। মানুষকে জন্তু

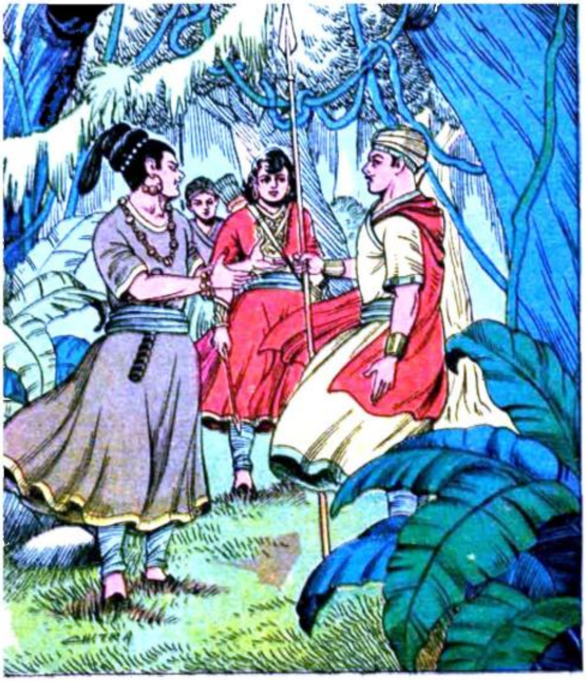

ছিঁড়ে খাবে এই দৃশ্য মানুষ হিসেবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা যায় না। আমার কাছে এ অসহ্য। তুমি বরং এক কাজ কর। ওই নেকড়েদের তাড়িয়ে দাও।" জীবদত্ত বলল।

জীবদত্তের কথা শুনে খড়্গবর্মা কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে তীর দিয়ে সকলের পেছনে যে নেকড়েটা ছিল তাকে বিদ্ধ করল। তীর বিদ্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ নেকড়েটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ছটফট করতে লাগল। তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে অন্য নেকড়েগুলো তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল নেকড়ের মাংস নেকড়েদের টেনে ছিঁড়ে খাওয়ার সেই দৃশ্য।

খড়্গবর্মা নেকড়েদের দিকে তাক করে আর একটা তীর ছুঁড়তে যাবে এমন সময় সমরবাহু বাধা দিয়ে বলল, "হুজুর, কেন ওই নেকড়েগুলোকে মারছেন? কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার খেলাটাতো বেশ জমে উঠেছে, চলুক না। আপনি ওদের মেরে ফেললে গুরু-ভালুক আর তার দলের লোককে খাবে কে?"

"সমরবাহু, গুরু-ভালুক আর তার দলের লোক মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি সব বিপদ কেটে যেত তাহলে আর কথা ছিল না। আমরা এক মহান উদ্দেশ্যে বিন্ধ্যাচলের দিকে যাচ্ছি। পথে আমাদের একটা না একটা বাধা পড়ছে। কোন বাধাই না সরিয়ে আমরা যেতে পারছি না।" জীবদত্ত বলল।

তারপর খড়্গবর্মার দিকে ঘুরে জীবদত্ত বলল, "এখান থেকে আমাদের তাড়াতাড়ি চলে যাওয়া উচিত। গুরু-ভালুকের ব্যাপারে আমাদের আর কিছু করার নেই। তবে ওকে একটা শেষ কথা বলে দেওয়া উচিত।" এই কথা বলে জীবদত্ত গুরু-ভালুকের দিকে ছুটে গেল। তাকে অনুসরণ করল অন্যেরা।

জীবদত্তকে আসতে দেখে তিনটে নেকড়ে গর্জন করতে করতে বনের ভিতরে ঢুকে গেল।

তারপর গুরু-ভালুকের কাছে যেতে যেতে জীবদত্ত গম্ভীর গলায় জোরে জোরে বলল, "ওহে গুরু-ভালুক, নাক-কান বুজে ছুটছ কেন ? দাঁড়াও, আর তোমার কোন ভয় নেই।" নিরুপায় হয়ে কাঠের মত গুরু-ভালুক দাঁড়িয়ে পড়ল।

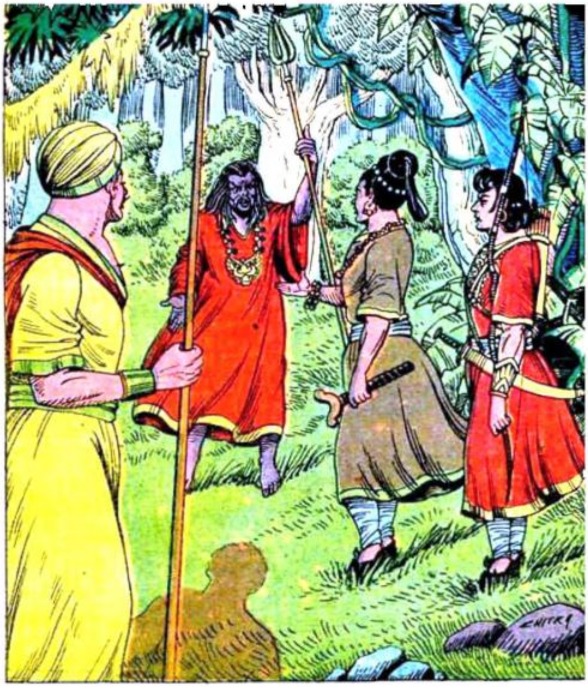

গুরু-ভালুক পরিষ্কার বুঝতে পারল যে শত্রুর খপ্পরে সে পড়ে গেছে। তার তখন আর শত চেষ্টা করেও পালানোর কোন পথ নেই। জীবদত্ত ও তার সঙ্গে যারা ছিল তাদের দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করে গুরু-ভালুক বলল, "মহাশয়, আমাকে প্রাণে মারবেন না। আমি যে পাপ করেছি তার জন্য আপনারা আমাকে যে শাস্তি দেবেন আমি মাথা পেতে তা মেনে নেব।"

"তুমি এমন একটা শাস্তির কথা বল তো, যাতে তোমার সমস্ত পাপ ধুয়ে মুছে যায় ? বল, এমন কোন্ শাস্তি আছে যা' তোমাকে দিলে তোমার হাতে যত লোক মারা গেছে প্রত্যেকে বেঁচে উঠবে। তুমি তো ইচ্ছে করলেই এই বনে মাটি খুঁড়ে গায়ে গতরে খেটে চাষ আবাদ করে, ফসল ফলিয়ে তোমার অনুচরদের নিয়ে ভালভাবেই দিন কাটাতে পারতে। ওসব না করে কোন এক বৃকেশ্বরী দেবীকে পূজো করার নামে কতগুলো লোককে প্রাণে মারলে বল দেখি ? আমাদের আসার আগে কত নিষ্পাপ শিশু, নারী আর পুরুষ তোমার হাতে অকালে প্রাণ দিয়েছে বল তো !" জীবদত্ত বলল।

"আমি বসে বসে খেতে চেয়েছিলাম। আমি কোনদিন পরিশ্রম করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল ফলিয়ে খেতে চাইনি। আপনারা যতদিন না এখানে এসেছেন আমি আমার ইচ্ছে মত চলতে পেরেছি। কেউ কোন বাধা দেয় নি। ভেবেছিলাম ঐ ভাবেই সারা জীবন কেটে যাবে, কেউ আমায় চলার পথে বাধা দেবে না। খুব আরামেই ছিলাম।" গুরু-ভালুক বলল।

"তা তো বুঝতেই পারছি। তা এখন কি করবে ঠিক করেছ ? তোমার অনুচররা

কোন শাস্তি দিতে চায় !" জীবদত্ত গম্ভীর স্বরে বলল।

ওরা কিছুদূর এগোতে না এগোতেই ভালুক দলের অনুচরদের ভয়ঙ্কর আর্তনাদ শুনতে পেল।

ওরা চোখের সামনে দেখতে পেল ওদের গুরুকে খড়্গবর্মা ও জীবদত্তের সঙ্গে। ওরা বুঝতে পারল ওদের গুরু শত্রুর কবলে পড়ে গেছে। বুঝেই ওরা অন্যদিকে পালাতে লাগলো। তখন গুরু-ভালুক চিৎকার করে বলল, "তোমরা পালিও না। বৃকেশ্বরী দেবীর দয়ায় আমা-দের আর কোন ভয় নেই।"

গুরুর কণ্ঠে অভয় বাণী শুনে ওরা কয়েকজন ভয়ে ভয়ে গুরুর কাছে এল। ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বলল, "গুরু, ওই পুকুরের কাছে চার-পাঁচজন রয়েছে। ওদের নেতা স্বর্ণাচারি। স্বর্ণাচারি আমাদের দুজনকে মেরে ফেলেছে। আর পাঁচজনকে বন্দী করে রেখেছে। আমরা কোন রকমে পালিয়ে এসেছি। খবরটা আপনাকে দেবার জন্যই ছুটে ছুটে এসেছি।"

স্বর্ণাচারির নাম শুনে জীবদত্ত, খড়্গবর্মা ও সমরবাহু অবাক হয়ে গেল। ওরা ভেবে পেল না দুর্গ নির্মাণের পরিকল্পনা করার দায়িত্ব যার উপর চাপানো আছে সে কেন চার-পাঁচজন লোক নিয়ে পুকুরঘাটে এল !

তো তোমাকে নেকড়েদের কাছে ফেলে পালিয়েছে ! একা কি করবে ?" খড়্গবর্মা প্রশ্ন করল।

"মশাই, আমার কোন অনুচর আমাকে ছেড়ে যায়নি। ওরা সব একটা পুকুর ঘাটে জড়ো হয়েছে। সেখানে দেবী বৃকেশ্বরীর আবির্ভাব ঘটবে। দেবী এখন আর সুড়ঙ্গে নেই। দেব-দেবীরা কখনও এক জায়গায় চিরকাল থাকেন না। আপনাদের আগমণের ফলে আমাদের সুড়ঙ্গ অপবিত্র হয়ে গেছে তাই দেবী পুকুরঘাটে চলে গেছেন।" গুরু-ভালুক বলল।

"ঠিক আছে, চল সেখানে। আমি তোমার দেবীকেই জিজ্ঞাসা করব, তোমাকে

খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত স্বর্ণাচারিকে কথা দিয়েছিল শত্রুর কবল থেকে সমরবাহুকে মুক্ত করে আনবে। ওদের আসার কারণ আছে। খড়্গবর্মা ও জীবদত্তর অনুপস্থিতি-তে ওরা আক্রান্ত হয়েছিল। কারণ সেই অঞ্চলটা ছিল বীরসিংহ নামক এক রাজার। বীরসিংহের রাজধানী বীরপুর। আর সেই বীরপুরেই একটি বনে পাহাড়ের পাশে স্বর্ণাচারি পরিকল্পনা করছিল দুর্গ তৈরি করার। সেখানকার আদিবাসীদের উপর মাঝে মাঝেই আক্রমণ চালিয়ে বীরসিংহ তাদের কাছ থেকে করস্বরূপ জন্তু জানোয়ারের চামড়া, মোটা চাল, তরি-তরকারী প্রভৃতি নানা প্রকার জিনিসপত্র আদায় করে নিয়ে যেত। এইভাবে নানান দিকে আক্রমণ করে রাজা বীরসিংহ তার কোষাগার সোনা, রুপা, ফসল প্রভৃতি দিয়ে বৃদ্ধি করত।

গুপ্তচরদের মাধ্যমে বীরসিংহ জানতে পারল যে বনের মধ্যে পাহাড়ের পাশে উটে চড়ে একদল লোক এসেছে। আরও জানতে পারল যে ভালুক-চামড়া পরা একদল লোক ঐ অঞ্চলে ঘোরাফেরা করে। যুবকদের ধরে নিয়ে গিয়ে গোলাম বানায়। আর তাদের দিয়ে চাষ আবাদের কাজ করিয়ে নেয়। ওদের দলে বেশ কয়েকজন লোক আছে।

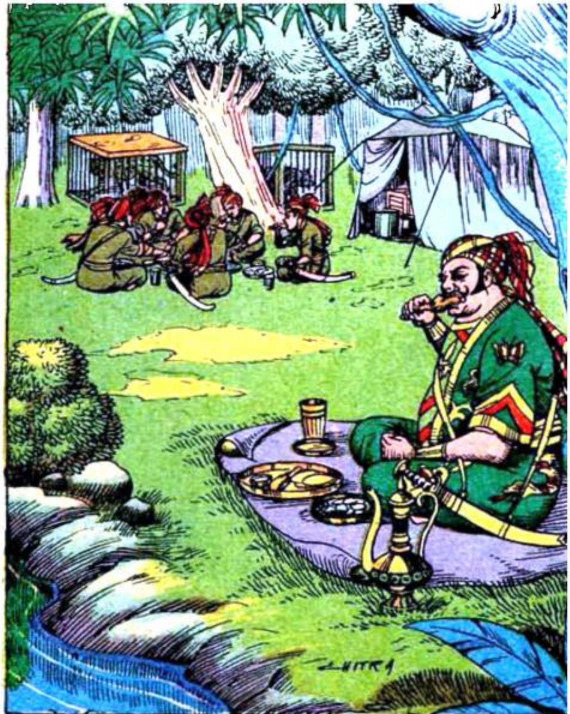

বীরসিংহ প্রথমে গুপ্তচরদের এই সব কথায় কান দেয়নি। সে মনে মনে ভেবে নিয়েছিল উটে চড়া লোকদের বিরুদ্ধে ভালুক-চামড়া পরা লোকগুলো যুদ্ধ করবে। এইভাবে দুটো দলই একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শেষ হয়ে যাবে। আর যদি তা না হয়ে একটি দল পরাজিত হয়ে অন্যদল শক্তিশালী হয়ে যায় তখন অন্য পরিকল্পনা করে ঐ শক্তিশালী দলকে পরাস্ত করা যাবে। অথবা তখন এমন কিছু করা যাবে যাতে ঐ দল প্রাণের ভয়ে এই অঞ্চল ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হবে। এই বনে এসে কোন নতুন দলের পক্ষেই সব পথ চিনে যুদ্ধ করে জয়ী হওয়া সহজ নয়।

তার চেয়ে পালানো অনেক সহজ। অতএব সেরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে তখন দেখে নেওয়া যাবে।

এদিকে এক সপ্তাহ আগে রাজা বীরসিংহ লোকজন সহ নতুন জন্তু জানোয়ার শিকার করার জন্য ওই বনে এসেছিল। ওরা জাল পেতে শিকার ধরার সব রকম আয়োজন করে শিকারের জন্য অপেক্ষা করছিল। যথাসময়ে তাদের জালে শিকার ধরা পড়ল। বহু বুনো পাখী ও বাঘ ধরা পড়ল। মনের আনন্দে ওরা ঐ বনে রান্না সেরে খেতে বসেছিল।

বীরসিংহের সেনাদের মধ্যে একজন তাড়াতাড়ি খেয়ে বনে ঘুরে ঘুরে চারদিকে নজর রাখছিল। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে লোকটা সেখান থেকে অনেক দূরে চলে গেল। হঠাৎ এক জায়গায় সে দেখতে পেল কিছুটা দূরে একটা মোটা গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে চারটে উট বাঁধা রয়েছে। লোকটা উটদের আকার সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছিল। কিন্তু কোনদিন নিজের চোখে সে দেখেনি। তাই দেখেই চিনতে পেরেছিল। আর কালমাত্র বিলম্ব না করে সে ফিরে গেল বীরসিংহের কাছে।

"উট? আমাদের রাজ্যে তো উট নেই? কোত্থেকে এল? কারা আনল?" এসব কথা ভাবতে ভাবতে সে ভয়ে কাঁপছিল।

খবর পেয়ে শিকারীদের মধ্যে যে নেতা সে খুব উৎসাহিত হয়ে বলল, "কোথায়? কোথায় আছে উট? চল—চল, ধরে আনি।"

কিন্তু সেই সেনাটি নিরুৎসাহিত হয়ে বলল, "আরে মশাই, অত হাঁকপাঁক কর-ছেন কেন? এই চারটে উট কখনও কি একা একা আসতে পারে বনে? নিশ্চয়ই তার সঙ্গে কিছু লোক আছে।"

"তাতে আমাদের কি এসে যায়! থাক না লোক! এই বীরপুর রাজ্যের প্রজা, মাটি, বন-জঙ্গল, জল, আকাশ সব কিছুর উপর পুরো অধিকার আছে আমাদের

মহারাজ বীরসিংহের। তোমরা তিন-চার জন গিয়ে ওই উটগুলো ধরে নিয়ে এসো। ওই উটের সঙ্গে কোন লোকজন যদি থাকে তাদের বল এখানে এসে দেখা করে যেতে।" প্রধান শিকারী বলল।

ওরা ভয় পেল, কিন্তু নিরুপায়। প্রধান শিকারী যখন বলছে, যেতেই হবে। শেষ পর্যন্ত চারজন সৈনিক বেরিয়ে পড়ল। উটগুলো আগে যেখানে ছিল সেখানেই রয়েছে। আশেপাশে কোন লোকজন নেই। চারজন সৈনিক সোজা গিয়ে উটগুলোর দড়ি খুলে টান দিতেই একটি উট পিছনের পা টান করে হিঁ হিঁ করে ডেকে উঠল। তার ডাক শুনে অন্য উটগুলোও ডাকতে শুরু করে দিল।

সমরবাহুর লোক উটগুলোকে গাছের সঙ্গে বেঁধে অদূরে প্রকাণ্ড একটা পুকুরের ঘাটে একটা গাছের নিচে বসে বিশ্রাম করছিল। হঠাৎ উটের ডাক শুনে ওরা ভাবল বাঘ অথবা সিংহ হয়ত উটের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে! ওরা তাড়াতাড়ি সেখান থেকে উঠে খোলা তরবারি হাতে নিয়ে ছুটে এল উটের কাছে।

উটগুলোকে যারা নিয়ে যেতে এসেছিল তারা সমরবাহুর লোককে খোলা তরবারি নিয়ে ছুটে আসতে দেখে নিজেরাও খাপ থেকে তরবারি বের করল।

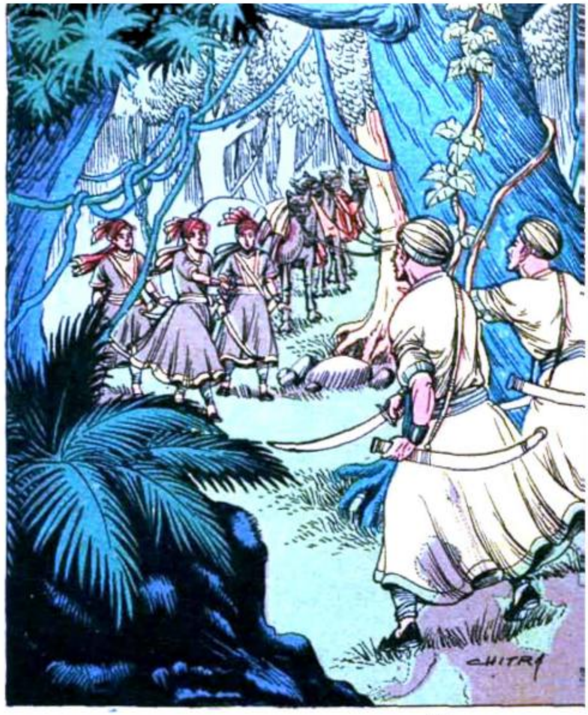

সমরবাহুর লোকের মধ্যে একজন দাঁতে দাঁত ঘষে চিৎকার করে বলল, "কারা তোমরা? পরেছ তো সৈনিকের পোশাক! কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে তোমরা চোর! আমাদের উট চুরি করতে এসেছ কেন?"

"আমরা চোর নই। মহারাজা বীর-সিংহের সৈনিক। তোমরা কেন আমাদের মহারাজাকে কর না দিয়ে উটগুলো নিয়ে এই বনে এসেছ? আমাদের উপর হুকুম হয়েছে উটগুলো নিয়ে যেতে।" একজন সৈনিক বলল।

"এখানে আবার বীরসিংহ নামে কেউ আছে নাকি? আমরা তো জানি এই বনটা আমাদের মহারাজা সমরবাহুর।

তোমরা আমাদের উটগুলো চুরি করতে এসেছ। এইজন্য তোমাদের আমরা কঠোর শাস্তি দেব। তোমরা এক্ষুণি তরবারি মাটিতে ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ কর।" সমরবাহুর একজন অনুচর বলল।

পালানোর পথ নেই ভেবেও বীরসিংহের চারজন সৈনিক তরবারি হাতে সমরবাহুর অনুচরদের সামনে রুখে দাঁড়াল। সেই তরবারি যুদ্ধে বীরসিংহের দুজন সৈনিক মারা গেল। একজন ভীষণভাবে আঘাত পেল। আর চতুর্থজন প্রাণ মুঠো করে পালিয়ে গেল। সোজা শিকারীদের প্রধান-কে গিয়ে খবর দিল।

"এ তো তাজ্জব কথা! উট কোনদিন মাংস খায় বলে তো আমি জানি না? তোমার সঙ্গে বাকি যে তিনজন গিয়েছিল ওদের কি উট খেয়ে ফেলেছে?" প্রধান শিকারী ক্রোধের সঙ্গে সৈনিককে জিজ্ঞেস করল।

"আরে মশাই, উট আমাদের ঘায়েল করেনি। উট যারা এনেছে, ওরাই আমা-দের লোককে মেরে ফেলেছে, ঘায়েল করেছে। তরবারি চালাতে ওরা খুব দক্ষ মনে হল।" সৈনিক বলল।

"আমি বিশ্বাস করি না যে তরবারি চালানোর ব্যাপারে আমাদের চেয়ে যোগ্য লোক আছে।" একথা বলে হাতে খাপ খোলা তরবারি নিয়ে এগিয়ে গেল প্রধান শিকারী। তার সঙ্গে গেল বাকি সৈনিক।

আঘাত পেয়ে পালিয়ে আসা সৈনিক ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। হঠাৎ আর্তনাদ করে বলল, "এই যে ওরা এদিকেই আসছে। ওরা যে কি ভয়ানক, এক্ষুণি টের পাবেন।"

শিকারী-প্রধান নিজের সৈনিকদের সাব-ধান করে দিয়ে সমরবাহুর লোকের দিকে এগিয়ে গেল।

(আরও আছে)

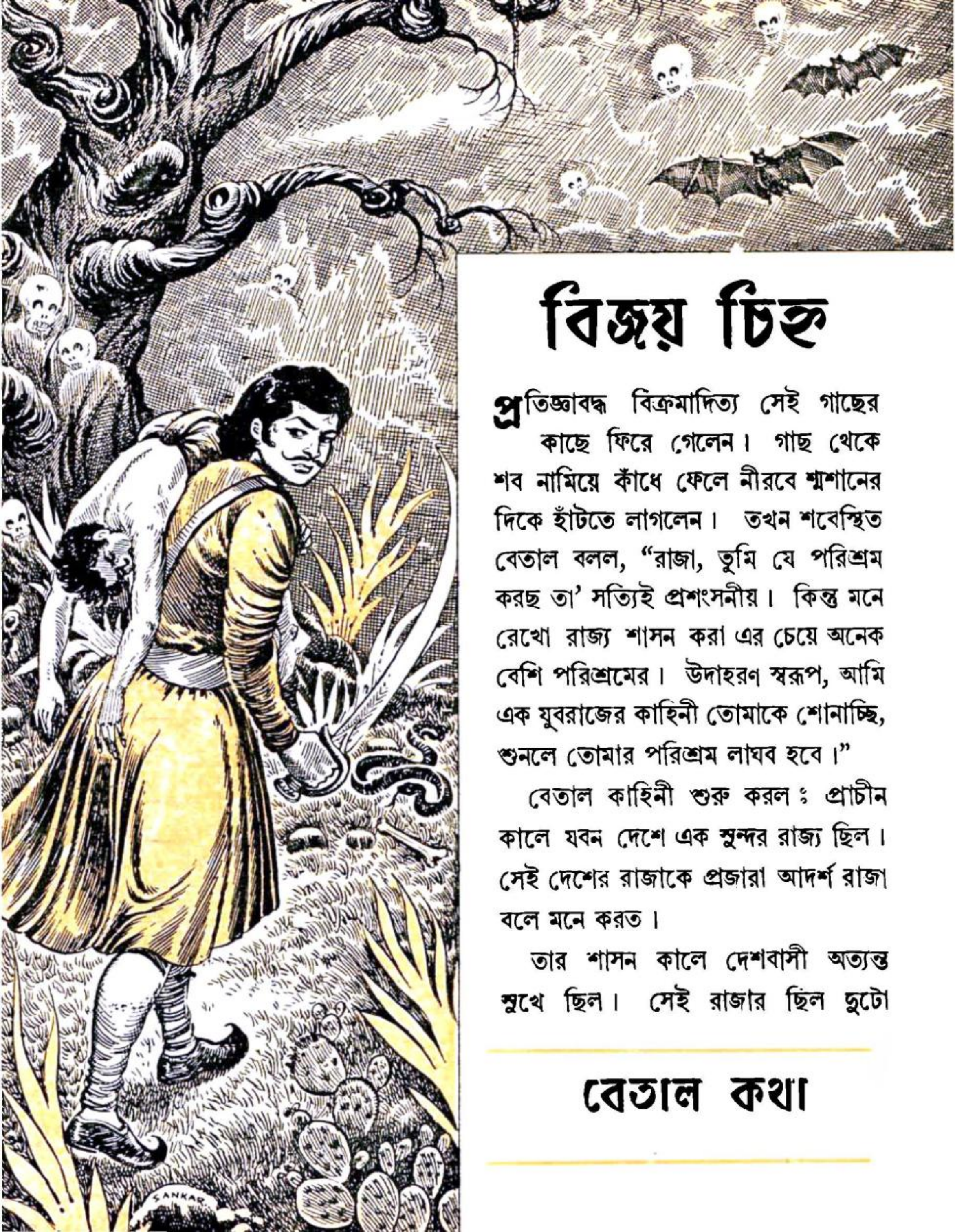

বিজয় চিহ্ন

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য সেই গাছের কাছে ফিরে গেলেন। গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, "রাজা, তুমি যে পরিশ্রম করছ তা' সত্যিই প্রশংসনীয়। কিন্তু মনে রেখো রাজ্য শাসন করা এর চেয়ে অনেক বেশি পরিশ্রমের। উদাহরণ স্বরূপ, আমি এক যুবরাজের কাহিনী তোমাকে শোনাচ্ছি, শুনলে তোমার পরিশ্রম লাঘব হবে।"

বেতাল কাহিনী শুরু করল: প্রাচীন কালে যবন দেশে এক সুন্দর রাজ্য ছিল। সেই দেশের রাজাকে প্রজারা আদর্শ রাজা বলে মনে করত।

তার শাসন কালে দেশবাসী অত্যন্ত সুখে ছিল। সেই রাজার ছিল দুটো

বেতাল কথা

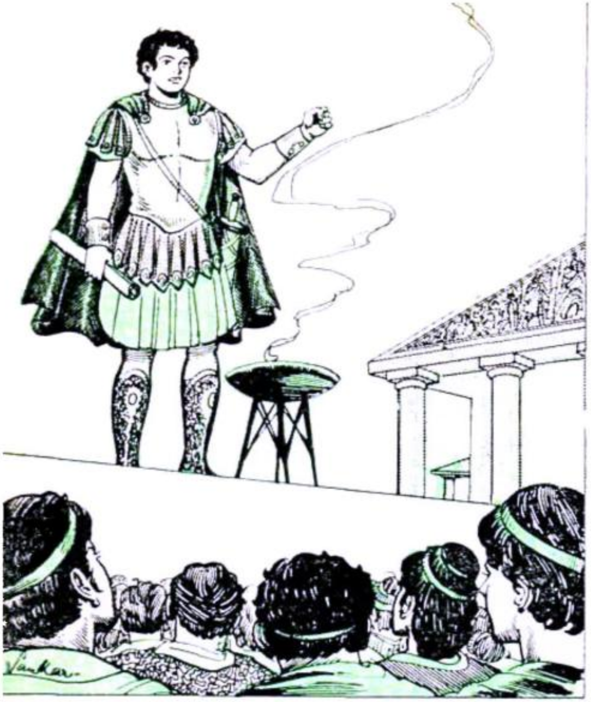

ছেলে। রাজার ইচ্ছে হল তার মৃত্যুর পরও দেশে ভাল শাসন যেন থাকে। প্রজারা যেন এখনকার মতই সুখে থাকে। রাজার ইচ্ছে হল তার দুই ছেলের মধ্যে ভাল শাসনকার্য চালানোর জন্য উপযুক্ত ছেলে যে কে, তা' একবার বাচাই করে দেখা। তাই সে ঠিক করল তার দুই ছেলের মধ্যে প্রজারা কাকে চায় তা' নির্বাচন করার ভার প্রজাদের হাতেই তুলে দেবে। প্রত্যেক বছর নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে। প্রজাদের মধ্যে রাজার ছাপ দেওয়া পত্র বণ্টন করা হবে। নির্বাচনের দিন প্রত্যেক গ্রামে দুটো করে বাক্স থাকবে। তার মধ্যে একটা বাক্স হবে বড় রাজকুমারের, অন্যটা ছোটর। প্রজারা নিজের ইচ্ছেমত গোপনে সেই মুদ্রাঙ্কিত পত্র যে কোন বাক্সে পুরে দেবে।

কিন্তু কোন বাক্স যে কার তা' চেনা যাবে কি করে? ঠিক হল এক একটা বাক্সে এক এক ধরণের চিহ্ন অঙ্কিত থাকবে। প্রথম নির্বাচনের সময় বড় রাজ-কুমারের বাক্সের উপর সিংহের চিহ্ন আঁকানোর ব্যবস্থা হয়েছিল।

নির্বাচনের আগে রাজা দুই কুমারকে অনুমতি দিল দেশে ঘুরে ঘুরে নিজেদের বক্তব্য প্রচার করতে।

বড় রাজকুমার দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে ঘুরে প্রচার করল যে সে রাজা হতে পারলে দেশে চাষ আবাদের সুবিধে করে করে দেবে, জল সেচের সুবিধে করে দেবে, পুকুর খোঁড়াবে, প্রজাদের জীবিকার উন্নতি ঘটাবে। আর প্রত্যেক গ্রামে হাঁসপাতাল ও পাঠশালা তৈরি করবে। তার বাবা জনতাকে সুখে রাখার জন্য যেভাবে কাজ করে থাকে সেও সেইভাবে কাজ করে যাবে।

দ্বিতীয় রাজকুমার প্রজাদের কাছে অন্য কথা প্রচার করল। সে বলল যে আশপাশে কোন শত্রু-রাজাকে রাখবে না। ওদের পরাজিত করে ওদের রাজ্য কেড়ে নেবে। নিজের রাজ্যের বিস্তার করবে। এইভাবে রাজ্যের যশ বৃদ্ধি করবে।

যথারীতি নির্দিষ্ট দিনে নির্বাচন হল। দেখা গেল দেশবাসী বড় রাজকুমারকেই পছন্দ করে।

ছোট রাজকুমার বাবাকে বলল, "আপনি আমার বাক্সে যদি সিংহের চিহ্ন আঁকিয়ে দিতেন তাহলে দেশবাসী আমাকেই বেশি পছন্দ করত। দাদা যে সবার সমর্থন পেয়েছেন তার কারণ ঐ চিহ্ন।"

"ওরে পাগলা, চিহ্নে কি এসে যায়! তোমার দাদা প্রজাদের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তাতেই প্রজারা তোমার দাদাকে পছন্দ করেছে। বেশ তো, তোমার যদি ইচ্ছে হয়, আগামী বছর তোমার বাক্সে সিংহের চিহ্ন আঁকা হবে। তখন বুঝতে পারবে কার জয় হবে।" রাজা ছোট রাজকুমারকে ভালভাবে বুঝিয়ে বলল।

নির্বাচনে জয়লাভ করে বড় রাজকুমার এক বছর রাজত্ব করল। নির্বাচনের আগে প্রজাদের কাছে সে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করল। প্রজারা তার শাসনে খুশী।

এক বছর পরে আবার রাজা নির্বাচনের তোড়জোর শুরু হয়ে গেল। সে বছর রাজার নির্দেশমত দ্বিতীয় রাজকুমারের বাক্সে সিংহের চিহ্ন আঁকা হল। আগের মত সে বছরও দুই রাজকুমার সারা দেশে ঘুরে ঘুরে নিজের নিজের কথা প্রচার করতে লাগল।

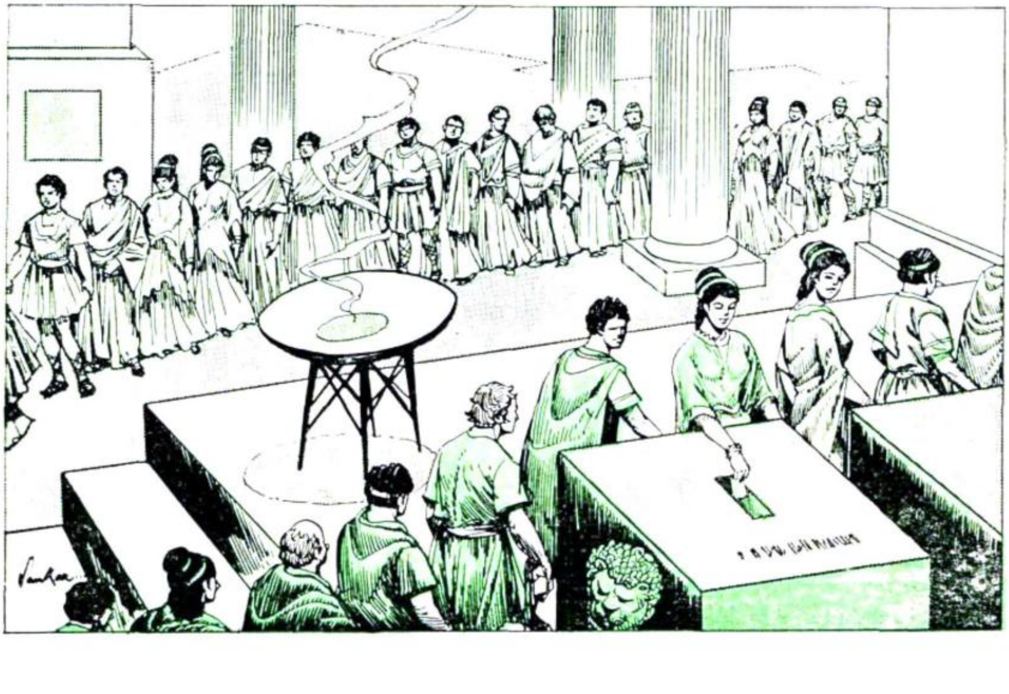

নির্বাচন হয়ে গেল। প্রজারা সে বছর দ্বিতীয় রাজকুমারকে নির্বাচন করল। দ্বিতীয় রাজকুমার সিংহাসনে বসে আশপাশের দেশের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ করল। বিভিন্ন পেশায় যারা জড়িত তাদের টেনে নিল সেনাবাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করার কাজে। ক্ষেত খামারের অসুবিধাগুলো দেখার জন্য লোক রইল না। বিরাট এক সর্বনাশের আগেই আবার নির্বাচন এসে গেল।

রাজা সেই বছর সিংহের চিহ্ন বড় রাজকুমারের বাক্সে লাগাতে চাইল। কিন্তু দ্বিতীয় রাজকুমার কিছুতেই তাতে রাজী হল না।

বড় রাজকুমার রাজাকে বলল, "ন্যায়সঙ্গতভাবে সিংহের চিহ্ন এ বছর আমারই পাওয়া উচিত।"

তখন রাজা বড় রাজকুমারকে কাছে ডেকে বুঝিয়ে বলল, "ওরে পাগলা, চিহ্নে কি এসে যায়? প্রথমবারে দেশবাসী নির্বাচনে তোমাকেই নির্বাচিত করেছিল। কারণ ওদের ধারণা ছিল সিংহাসনের তুমিই উত্তরাধিকারী। কিন্তু দ্বিতীয়বার ওদের ইচ্ছে হল ছোট রাজকুমারের হাতে শাসন ক্ষমতা দিয়ে একবার পরখ করে দেখার। এখন ওরা দুই রাজকুমারেরই শাসন দেখে নিয়েছে। আর চিহ্ন নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন দরকার নেই। আমার ধারণা এবছর প্রজারা তোমাকেই বেছে নেবে। আর যাই হোক প্রজাদের অত বোকা ভেব না।"

বাবার কথা মন দিয়ে শুনে বড় রাজকুমার চিহ্ন নিয়ে মাথা ঘামালো না, আর এ বিষয়ে কোন কথাও সে বলল না। ফলে সেবারেও সিংহের চিহ্ন পেল দ্বিতীয় রাজকুমার।

তৃতীয় নির্বাচনেও দ্বিতীয় রাজকুমারেরই জয় হল। তৎক্ষণাৎ রাজা দেশটাকে দুভাগ করে দুই রাজপুত্রের মধ্যে ভাগ করে দিল। আর নিজে সন্ন্যাসীর পোশাকে মঠে চলে গেল।

বেতাল এই কাহিনী শুনিয়ে বলল, "রাজা, এখন আমার মনে প্রশ্ন জেগেছে। তৃতীয়বারের নির্বাচনেও প্রজারা কেন অযোগ্য দ্বিতীয় রাজকুমারকে নির্বাচন করল? রাজা তো শুধু বড় রাজকুমারকে রাজত্ব দিতে পারত। রাজ্যটাকে ভাগ করতে গেল কেন? আর সন্নাসীর পোশাক পরেই বা মঠে চলে গেল কেন? আমার এই প্রশ্নের সমাধান জানা সত্ত্বেও যদি না জানাও, তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।"

তারপর বিক্রমাদিত্য বললেন, "প্রজারা শুধু ভাল শাসন কাকে বলে তাই জানত। খারাপ শাসনের ফলে যে কি হয় সে ব্যাপারে তাদের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। ওদের কাছে সিংহ চিহ্ন ভীষণ ভাবে ভাল লেগে গেল। মনে হয় যেন ওই সিংহ চিহ্নের জন্যই ছোট রাজকুমার বার বার নির্বাচিত হয়ে যেত। এই ধরণের একটা আশঙ্কা করেই রাজার মাথা ঘুরে গেল। রাজার যে ধারণা ছিল প্রজারা বোকা নয়, সে ধারণা তার বদলে গেল। তার মনে হল জনতা যে কি চায় তা' বড় রাজকুমারের চেয়ে ছোট রাজকুমার বেশি বুঝেছে। এহেন ছোট রাজকুমারকে একেবারে রাজত্ব না দিয়ে বঞ্চিত করা ভুল হবে। আবার বড় রাজকুমারকে বঞ্চিত করা অন্যায় হবে ভেবে রাজা রাজ্যকে দুভাগ করে দুই রাজকুমারকে দিয়ে দিলেন। তারপর তাঁর আর ইচ্ছে করল না এই রাজ্য শাসন পদ্ধতির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রাখার। কারণ তার ধারণা হল, সুশাসন বলতে কি বোঝায় তা' তিনি প্রজাদের মধ্যে ভাল ভাবে প্রচার করতে পারেননি। কুশাসনের বিরুদ্ধে প্রজাদের মুখর হতে শেখান নি। এ ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ।"

রাজা বিক্রমাদিত্যের মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে চলে গেল গাছে।

(কল্পিত)

মন্ত্রীর বুদ্ধি

প্রাচীনকালে এক রাজা প্রত্যেক বছর একটি নির্দিষ্ট দিনে পণ্ডিতদের প্রচুর পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করতেন। কিন্তু একবছর হঠাৎ রাজা লক্ষ্য করলেন যে পুরস্কার দেবার মত অর্থ তাঁর কোষে নেই। রাজা মহা দুর্ভাবনায় পড়লেন।

শেষে রাজা তাঁর মনের কথা মন্ত্রীকে জানালেন। মন্ত্রী রাজাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। তিনি সব কিছু ঠিক করে দেবেন। নির্দিষ্ট দিনে পুরোনো পণ্ডিততো এলেন, নতুন পণ্ডিতও অনেক এলেন।

মন্ত্রী পুরোনো পণ্ডিতদের এক জায়গায় অপেক্ষা করতে বললেন আর নতুন পণ্ডিতদের অন্য জায়গায়। তারপর মন্ত্রী নতুন পণ্ডিতদের সামনে গিয়ে বললেন, "রাজার স্বাস্থ্য ভাল নেই। তাই এবছর নতুন পণ্ডিতদের পুরস্কার দেওয়া হবে না। অতএব, আপনারা যেতে পারেন।" নতুন পণ্ডিতরা চলে গেল।

তার পরেই তিনি গেলেন পুরোনো পণ্ডিতদের কাছে। বললেন, "রাজার শরীর ভাল নেই। তিনি তাই শুধু নতুন পণ্ডিতদের পুরস্কার দেবেন। আপনারা এখন যেতে পারেন।" একথা বলে তিনি পুরোনো পণ্ডিতদের ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।

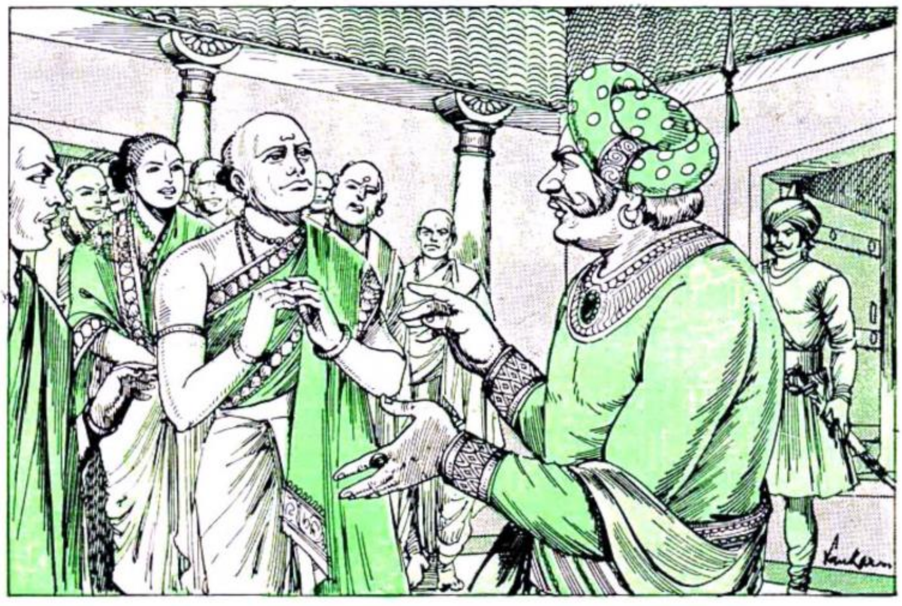

সাধনা

প্রাচীনকালের কথা। একদিন রাজ-প্রাসাদে এক বৈরাগী এসে বলল, "মহারাজ, আমার ঘটে অনেক বুদ্ধি আছে, কিন্তু সেই বুদ্ধি কার্যকরী করতে পারছি না। কেউ আমার বুদ্ধিকে কাজে লাগাচ্ছে না। কি করি বলুন তো?" একথা বলে বৈরাগী চলে গেল। তারপর থেকে প্রতি-দিন ঐ রাজপ্রাসাদে বৈরাগী আসত, ওই কথাগুলো বলত এবং চলে যেত।

একদিন রাজা ওই বৈরাগীকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি রোজ এসে যে কথাগুলো বল তার মানে কি?"

"মহারাজ, প্রয়োজন মত আপনি আমাকে যত অর্থ দেবেন, আমি আপনার খাজানা অর্থে ভরে দেব তার দশগুণ দিয়ে। গৃহস্থ-ধর্ম ত্যাগ করার পর আমি এই ক্ষমতা অর্জন করতে পেরেছি।" বৈরাগী জবাবে বলল।

রাজা বৈরাগীকে তার প্রয়োজন মতো অর্থ দিতে রাজী হলেন। কিন্তু মন্ত্রী পরামর্শ দিল, "মহারাজ, একেবারে দশগুণ করে দেবে বলছে, নিশ্চয় কোন গোলমাল আছে। এসব বৈরাগীকে বিশ্বাস নেই।"

তা সত্ত্বেও রাজা বৈরাগীকে কিছু অর্থ দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।

একবছর পরে বৈরাগী আবার রাজার কাছে এসে বলল, "মহারাজ, আমাকে মনে আছে তো? আমি আমার কথা রাখব। এখন আবার কিছু অর্থের দরকার পড়েছে।"

"মহারাজ, এই বৈরাগীকে কারাগারে নিক্ষেপ করার অনুমতি দিন!" মন্ত্রী গোপনে রাজাকে বলল।

বোম্মানা বিশ্বনাথম্

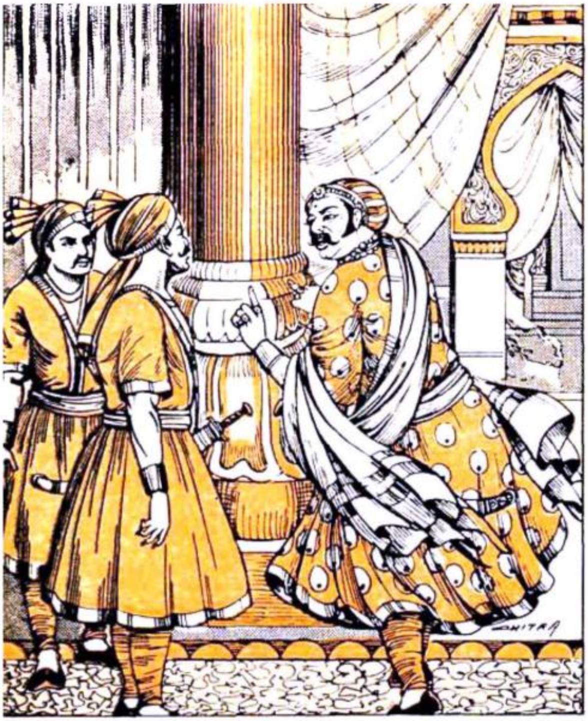

"এখনও সময় হয়নি। এই বৈরাগী আমাকে বিশ্বাস করতে বলেছে, ধৈর্য ধরতে বলেছে।" মন্ত্রীকে এই কথা বলে রাজা বৈরাগীকে আবার কিছু টাকা দিলেন।

আবার একবছর কেটে গেলে। বৈরাগী রাজার কাছে এসে বলল, "মহারাজ, আমার সাধনা শেষ হতে আর বেশি বাকি নেই। সামান্য অর্থের অভাব পড়ে গেছে। এই অর্থের জন্যই আপনার কাছে এসেছি।"

মন্ত্রী আর রাগ চাপতে না পেরে বলল, "তুমি বার বার আজেবাজে কথা বলে অর্থ নিয়ে যাচ্ছ। আসল ব্যাপারটা যে কি তা' যদি তুমি না বল, তাহলে আমি তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করব।"

রাজা এইবারেও মন্ত্রীকে শান্ত করে বৈরাগীকে অর্থ দিয়ে বিদায় করলেন।

একবছর পরে বৈরাগী আবার এল। "তোমার কি আরও অর্থ চাই?" রাজা জিজ্ঞেস করলেন। মন্ত্রী বৈরাগীর উপর চালানোর জন্য তরবারি তুলল।

"মহারাজ, আপনার ধৈর্যের জন্য ধন্যবাদ। আমার সাধনা পূর্ণ হয়েছে। আপনারা এবার চলুন আমার সঙ্গে।" বৈরাগী বলল।

রাজাকে বৈরাগীর সঙ্গে যেতে প্রস্তুত হতে দেখে মন্ত্রী বলল, "এই বৈরাগী আমাদের দুজনকে ডাকছে। কোথায় যেতে হবে, কেন যেতে হবে, এসব না জেনে আমাদের যাওয়া কি উচিত হবে মহারাজ?"

"মহামন্ত্রী আমি যে বৈরাগীকে কথা দিয়েছি ধৈর্য ধারণ করার। তুমি কি মনে করছ সে রকম অবস্থায় পড়লে আমরা নিজেদের রক্ষা করতে পারব না?"

"মহামন্ত্রীর যদি মনে ভয় ঢুকে থাকে তাহলে তিনি সঙ্গে দুজন অঙ্গরক্ষক আনতে পারেন, মহারাজ!" বৈরাগী বলল।

"অঙ্গরক্ষকদের কোন প্রয়োজন নেই। চলো।" রাজা বললেন। তা' সত্ত্বেও মন্ত্রী পিছনে পিছনে আসার জন্য দুজন অঙ্গরক্ষককে নির্দেশ দিল।

বৈরাগী রাজা আর মন্ত্রীকে নিয়ে পাহাড় ও বন পেরিয়ে সমুদ্রের তীরে গেল।

সেখানে একটি ছোট নৌকা ছিল। বৈরাগী মন্ত্রী ও রাজা সেই নৌকায় বসল। এছাড়া মাত্র দুজন মাঝি ওই নৌকায় বসতে পারে। ফলে ঐ দুজন অঙ্গরক্ষক আর সমুদ্রে পাড়ি দিতে পারল না।

নৌকা উঠল এক ছোট্ট দ্বীপে। সেই দ্বীপে পা ডুবে যাওয়ার মত ছাই ছিল। তার ওপর উড়ে বেড়াচ্ছিল ঝাঁকে ঝাঁকে কয়েকটি বক। মাঝামাঝি সুড়ঙ্গ পথ ছিল। সেই পথে এগিয়ে গেল বৈরাগী।

"এই দ্বীপটিকে দেখে মনে হচ্ছে একটা ঐন্দ্রজালিক দ্বীপ। তুমি আমাদের এখানে আনলে কেন?" মন্ত্রী বৈরাগীকে জিজ্ঞেস করল।

"আপনি তাড়াহুড়ো করবেন না। এই দ্বীপ খুব ছোট দ্বীপ। বেশি হাঁটাচলা করলে ছাই বেশি উড়বে। তার ফলে বকগুলো ঘাবড়ে উড়ে পালিয়ে যাবে। বৈরাগী হঠাৎ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে লোহার দরজা খুলল। রাজাকে বলল উনি যেন ঐ দরজা দিয়ে ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে সেখানে কি কি আছে দেখে আসেন। রাজার ফিরে আসা পর্যন্ত মন্ত্রী তার পিঠে খাপখোলা তরবারি ধরে রইল।

রাজা ঐ সিঁড়ি দিয়ে নেমে মুক্তোর ঢিবি দেখতে পেয়ে ফিরে এলেন। মন্ত্রীকে গিয়ে দেখে আসতে বললেন। মন্ত্রী দেখে এসেই বৈরাগীর কাছে ক্ষমা চাইল।

বৈরাগী বলল, "আমি এক ব্যবসাদার। আমার নাম সদানন্দ। ব্যবসার উদ্দেশ্যে দেশে দেশে ঘুরে এই দ্বীপের সন্ধান পাই। এই দ্বীপের চারদিকে চরা পড়ে। ভাটার সময় সেই চরা ভেসে ওঠে। তখন অসংখ্য ঝিনুক পড়ে থাকে। বকগুলো মাংস খেতে জড়ো হয়। ঝিনুকে থাকে মুক্তো। আমি সেই মুক্তো কুড়িয়ে কুড়িয়ে জড়ো করতাম। আমি যখন এদিকে মুক্তো কুড়োতে ব্যস্ত, ওদিকে তখন বাড়িতে আমার স্ত্রী-পুত্র মারা গেল। তাদের মৃত্যুর পর আমার মধ্যে বৈরাগ্যের ভাব জাগল। কিন্তু আমি পুরোপুরি বৈরাগী হতে পারছিলাম না। মুক্তোর নেশা আমাকে বৈরাগী হতে দিচ্ছিল না। মুক্তোর প্রতি আমার এই টান যাতে শেষ হয় তার জন্য আমি একটা পরিকল্পনা করলাম। আর সেই পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য আপনার কাছ থেকে অর্থ নিয়ে এসেছি। সেই অর্থ দিয়ে ভূগর্ভে, যেখানে মুক্তো দেখে এসেছেন, সেই সুরক্ষিত জায়গা তৈরী করিয়েছি। দ্বীপে ছাই ছড়ানোর ব্যবস্থা করেছি, যাতে বকগুলো ঝিনুক দেখতে না পায়। একটা একটা করে ঝিনুক তুলে, মুক্তো বের করে মাটির নীচের ওই ভাণ্ডারে জমিয়েছি। তার জন্যই প্রয়োজন হয়েছে নৌকা, মাঝি আর মজুরের। সমস্ত কাজ গোপনে করার জন্যই আপনাকে এত বছর বলতে পারিনি। আমি যে পরিকল্পনা করেছিলাম সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী এতদিনে আমার কাজ শেষ হয়েছে। এখন থেকে আপনি হলেন এই সমস্ত মুক্তোর অধিকারী। আমার নিজের জীবনের প্রতি মায়ামমতা নেই। আমি এখন কোন কিছুর প্রতি আকর্ষণ রাখতে চাই না। নিশ্চিন্ত মনে তপস্যা করতে চাই। আপনারা এই মুক্তো গ্রহণ করে প্রসন্ন থাকুন।" এই কথা বলে বৈরাগী নিজের পথে চলে গেল।

পায়েস চোর

এক গ্রামে ছিল এক ধনী। দানধর্ম করে লোকটার বেশ সুনাম হয়েছিল। একবার তার বাড়িতে বহুলোক খেল। ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ সবাই আমন্ত্রিত হয়েছিল।

সকলের খাওয়ার শেষে ঠাকুর রান্না ঘর থেকে পায়েস চুরি করে খিড়কির দরজা দিয়ে পালাচ্ছিল। পাহারাদার তাকে হাতেনাতে ধরে ধনীর কাছে নিয়ে এল।

ধনী তাকে জিজ্ঞেস করল, "চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিলে কেন? আমার কাছে চাইলে কি আর দিতাম না? ব্রাহ্মণ অপমান ও লজ্জায় মাথা হেঁট করে বলল, "আজ্ঞে আমিতো পেট-ভরে খেয়েছি। আমার বাড়ির অন্যেরা তো খায়নি। ওদের জন্য নিয়ে যেতে ইচ্ছে করল। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমি ভুল করেছি।"

"ভুলতো করেছ? ঘি ছাড়া পায়েস খেলে তোমার পরিবারের লোকের পেট ব্যথা করবে না। যাও, রান্না ঘর থেকে ঘি নিয়ে যাও।" ধনী বলল।

ধনীর এই কথা শুনে ব্রাহ্মণের মাথা কৃতজ্ঞতায় নত হল।

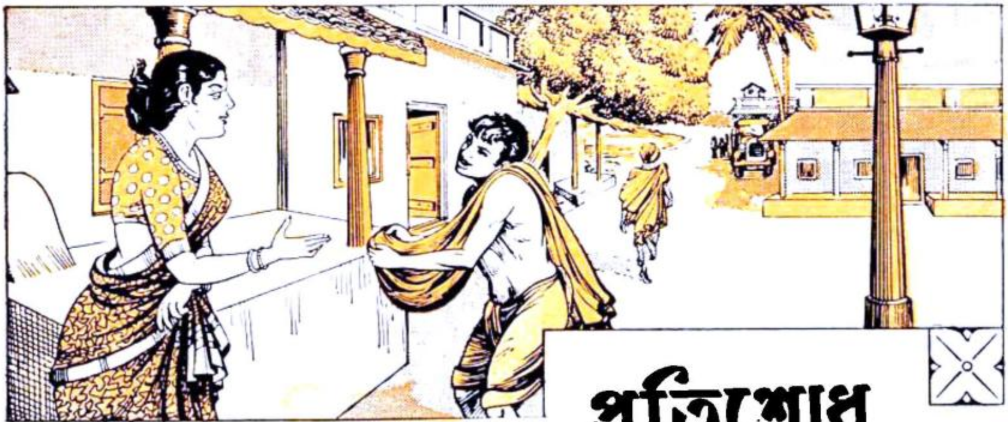

প্রতিশোধ

এক গাঁয়ে মাধব নামে এক যুবক ছিল। আলু ভাজা অথবা আলুর যে কোন তরকারি তার খুব পছন্দ। যে কোন কারণে টানা কয়েকদিন বাজারে আলু পাওয়া যায়নি। দিনের পর দিন আলুর খোঁজ করেও না পেয়ে সে শহরে গেল আলু কিনতে।

মাধব শহরে পৌঁছে দেখে একটা গাড়ি থেকে বস্তা বস্তা আলু নামানো হচ্ছে। যারা আলু নামাচ্ছিল মাধব হঠাৎ তাদের সঙ্গে কাজে হাত লাগালো। তার কাজ দেখে খুশী হয়ে তাকে যখন মালিক মজুরি দিতে গেল, তখন সে তা' নিতে রাজী হল না। তার বদলে নিতে চাইল আলু। আলু পেয়ে মহানন্দে মাধব আপনমনে গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে এগিয়ে গেল।

পথের ধারে এক বাড়ির দরজার কাছে দাঁড়িয়ে এক মহিলা মাধবকে বলল, "ভাই, পোঁটলা বেঁধে কি নিয়ে যাচ্ছ?"

মাধব সেই মহিলার কাছে গিয়ে বলল, "মা, আমি পাশের গ্রামের বাসিন্দা। দুদিন ধরে কিছু খেতে পাইনি। দুটো আলু সেদ্ধ করে দেবেন? আপনার অনেক পূণ্য হবে!"

মহিলারও আলু খুব পছন্দ। কয়েক-দিন ধরে বাজারে আলু না ওঠায় আরও অসুবিধে হয়েছিল। উপরন্তু তার স্বামীর এক কঠিন অসুখ করায় ডাক্তার তাকে আলু খেতে বারণ করেছে। কদিন ধরে বাড়িতে আলু রান্না একেবারে বন্ধ। এমন সময় মাধবের অনুরোধ শুনে মহিলার খুব ভালো লাগল। বাড়িতে তখন তার স্বামীও

উপস্থিত ছিল না। তাই মহিলা মাধবের প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল।

মাধব যত আলু এনেছিল সব মহিলার হাতে দিয়ে, শহর ঘুরে দুপুর নাগাদ আসব বলে চলে গেল। কিন্তু মাধবের ফেরার আগেই মহিলা সব আলু সেদ্ধ করে খেয়ে নিল।

দুপুরে মাধব ফিরে এল। সে ভেবেছিল মহিলা তাকে শুধু আলু সেদ্ধই দেবে না, দুমুঠো ভাতও খাওয়াবে। সে যা ভেবেছিল তাই হল। মহিলা কলার পাতায় ভাত দিল। ডালও দিল। তারপর অন্য ঘরে চলে গেল। মাধব অপেক্ষা করতে লাগল আলুর তরকারির। অপেক্ষা করতে করতে তার খাওয়া হয়ে গেল কিন্তু আলুর তরকারি এল না।

অনেকক্ষণ পরে মহিলা এসে আবার কিছু ডাল-ভাত দিয়ে বলল, "অত তাড়াহুড়োর কিছু নেই। দুদিন খাওয়া হয়নি, ধীরে সুস্থে খাও।"

মাধব আর থাকতে পারল না। বাধ্য হয়ে মহিলাকে বলল, "মা, আমার আলু দিয়ে কিছু করেন নি ?"

"এই যাঃ, বলতে ভুলে গেছি! তোমার আলু এক হাঁড়ি জলে সেদ্ধ করতে বসিয়েছি। সব গলে একেবারে কাই হয়ে গেছে। তুমি বাবা কিছু মনে করো না।" ঐ মহিলা বলল।

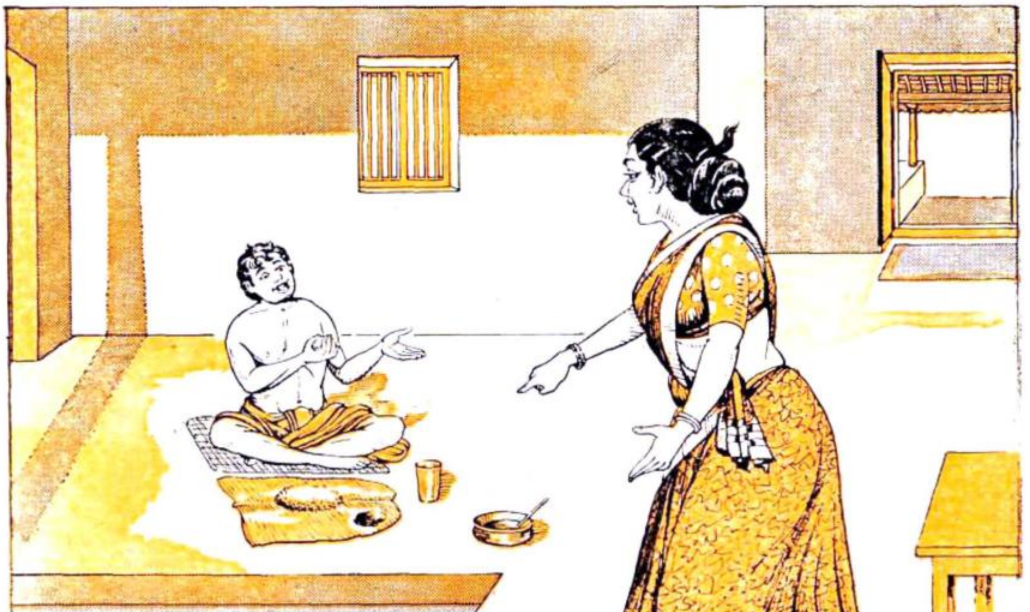

"তাতে কি হয়েছে! পেট ভরে তো খাইয়েছেন! আলু আজ না হয় কাল খাব। মা, আমার একটা উপকার করতে হবে। দুদিন ধরে চান করিনি। ঠাণ্ডা জলে চান করার অভ্যেস নেই। আপনি দয়া করে একটা হাঁড়ি আর কিছু কাঠ দিলে বাইরেই জল গরম করে চান করে নিতে পারি।" মাধব বলল।

মহিলা মাধবের আলু সব খেয়ে নেবার ফলে মনে মনে তার প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল। তাই সে মাধবের এই প্রস্তাবে গররাজী হতে পারল না। তাকে হাঁড়ি এবং কাঠ দিল।

মাধব সেই হাঁড়ি নিয়ে দূরের কলতলায় একটি মাটির হাঁড়ির জায়গায় ওই হাঁড়িটিকে রেখে মাটির হাঁড়িতে জল ঢেলে নিয়ে চলে এল। মহিলার বাড়ির সামনে উনুন তৈরি করে তার উপর ওই মাটির হাঁড়ি বসাল।

অনেকক্ষণ পরে মহিলা বাইরে এসে দেখে উনুনে মাটির হাঁড়ি রয়েছে। মহিলা খুব আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, "এ কি, আমার হাঁড়ি কোথায়? উনুনের উপর মাটির হাঁড়ি কেন?"

"এই রে! আঁচ বেশি হয়ে গেছে তো, ওই জন্য তেতে মাটির হাঁড়ির মত দেখাচ্ছে।" মাধব বলল।

"আমাকে ধোকা দিতে চাইছ? সত্যি কথা বল, আমার হাঁড়ি কোথায় লুকিয়ে রেখেছ? রেগে গিয়ে মহিলা বলল।

মাধব আরও চিৎকার করে বলল, "ধোকা কে কাকে দিচ্ছে? আলু গলে যেতে পারে আর আপনার হাঁড়ি মাটির হাঁড়ির মত দেখাবে না।"

মহিলা রাগে ক্ষোভে দরজা বন্ধ করে দিল। মাধব যথাস্থানে মাটির হাঁড়ি রেখে ধাতুর হাঁড়ি বাজারে বিক্রি করে সিকি মন আলু কিনে মহানন্দে বাড়ি ফিরল।

রূপমতীর বিবাহ

সাতগড়ের রাজার নাম শুভদেব। তার ছিল একটি মাত্র কন্যা। নাম তার রূপমতী। মেয়ে বড় হলে রাজা শুভদেব তার বিয়ের জন্য যোগ্য পাত্রের সন্ধান করবেন ঠিক করলেন। রাজা শুভদেব রাজকুমারী রূপমতীকে বহু কলায় দক্ষ করে তুলেছিলেন। মেয়েটিকে তিনি বিদুষী করে তুললেন। স্বয়ম্বর সভার ব্যবস্থা করে বিভিন্ন দেশের রাজাদের কাছে তিনি দূত পাঠালেন। রূপমতীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে স্বয়ম্বর সভায় যে প্রতিযোগিতা হল তাতে অংশগ্রহণ করার জন্য বহু রাজকুমার হাজির হল।

ধনুর্বিদ্যা, ঘোড়সওয়ার ও খড়্গযুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি ছিল প্রতিযোগিতার বিষয়। দুশো রাজকুমার অংশগ্রহণ করলেও সমস্ত বিষয়ে সফল হল মাত্র তিনজন। তারপর সমস্যা দেখা দিল তিনজন রাজকুমারের মধ্যে কে যে যোগ্যতম তা' ঠিক করা যায় কিভাবে!

"তোমাদের মধ্যে কে যে যোগ্যতম তা' যাচাই করতে আমরা আর একটা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছি। তোমরা প্রস্তুত হও।" প্রধানমন্ত্রী বললেন। তিন রাজকুমার প্রস্তুত হল।

"তোমাদের তিনজনের মধ্যে কার সহ্যশক্তি বেশি তার পরীক্ষা আলাদা আলাদা ভাবে নেওয়া হবে।" প্রধানমন্ত্রী ওদের তিনজনের উদ্দেশ্যে বললেন।

সমস্ত প্রতিযোগিতায় বিজয়ী তিন রাজকুমার—অমিতাভ, রুদ্ররাজ ও বেনুদেব রাজী হয়ে গেল সহ্যশক্তির পরীক্ষা দিতে।

এ. সি. সরকার (জাদুকর)

অমিতাভ সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোদে দাঁড়িয়ে অন্নজল গ্রহণ না করে নিজের সহ্যশক্তির পরিচয় দিল।

রুদ্ররাজ খাওয়া দাওয়া ছেড়ে কড়া রোদে তপ্ত পথের উপর দিয়ে খালি পায়ে কুড়ি মাইল ছুটল।

আর বেনুদেব জাদুবিদ্যায় পারদর্শী ছিল। তার সঙ্গে যে চাকর এসেছিল সেও কিছু কিছু জাদুবিদ্যা জানত। সেইজন্য বেনুদেব তাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরত।

এখন বেনুদেব সহনশক্তির পরীক্ষায় চাকরের সাহায্য নিল।

কুড়িটা ছুঁচ আনাল বেনুদেব। বাঁ হাতের মুঠোয় একটি রেশমী রুমাল জড়িয়ে নিল। রাজাকে বলল বেনুদেব তার বুড়ো আঙ্গুলে ছুঁচ ফুটিয়ে দিতে। রাজা রেশমী রুমালে ঢাকা বেনুদেবের আঙ্গুলে কুড়িটা ছুঁচ ফুটিয়ে দিলেন। বেনুদেবের চোখে মুখে যন্ত্রণার কোন ছাপ নেই। বেনুদেবের এই ভয়ঙ্কর সহ্যশক্তির পরিচয় পেয়ে রাজসভার প্রত্যেকে বিস্মিত হল। আবার ছুঁচগুলো সব তুলে ফেলার পর রেশমী রুমাল বেনুদেব পকেটে রেখে দিল। সকলের বিচারে বেনুদেবের সহ্যশক্তি সকলের চেয়ে বেশি। অতএব তার সঙ্গেই রূপমতীর বিয়ে ঘটা করে হল।

কয়েক বছর কেটে গেল। রাজা শুভদেব মৃত্যুবরণ করলেন। সিংহাসনে বসার

অধিকারী হল বেনুদেব। শুভদেব ঘোষণা করে গিয়েছিলেন যে তার মৃত্যুর পর বেনুদেব রাজা হবে।

একদিন বেনুদেব রূপমতী ও তার দুই কন্যাকে নিয়ে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এক জায়গায় বুনো গোলাপের ঝাড় দেখতে পেল। বেনুদেবের এক কন্যা লাজবতীর গোলাপ খুব পছন্দ। সে বায়না ধরল একটি গোলাপের জন্য।

একটি গোলাপ তুলে আনতে বেনুদেব তার এক চাকরকে নির্দেশ করল। কিন্তু লাজবতী বায়না ধরল তার বাবাই যেন একটা গোলাপ পেড়ে এনে তার হাতে দেয়।

"মেয়েটা অত করে চাইছে, একটা ফুল পেড়ে এনে দিচ্ছেন না কেন?" রূপমতী বেনুদেবকে বলল।

বেনুদেব ফুল তুলতে গিয়ে হঠাৎ বলে উঠল, "আঃ! গোলাপের কাঁটা হাতে ফুটে গেছে।"

"সামান্য গোলাপের কাঁটা ফুটতেই এমন করছেন? এতো বাচ্চারাও সহ্য করতে পারে! দেখি তো রক্ত বেরিয়েছে কিনা?" রূপমতী বলল।

বেনুদেব নিজের বাঁ হাতের বুড়ো আঙ্গুলটা দেখাল।

"আশ্চর্য ব্যাপার! আপনি স্বয়ম্বর সভায় সহ্য শক্তির পরীক্ষা দিতে গিয়ে এই

বুড়ো আঙ্গুলে কুড়িটা ছুঁচ ফুটিয়ে নিলেন, তখন তো আপনার একটুও কষ্ট হয়নি। আর এখন সামান্য একটা কাঁটা বিঁধতে না বিঁধতেই অমন করে চেঁচিয়ে উঠলেন?" রূপমতী বলল।

"তুমি ভুল করছ! আমার মধ্যে সহ্য-শক্তি মোটেই নেই। প্রতিযোগিতায় আমি জাদুর সাহায্যে বিজয়ী হয়েছিলাম। তোমার রূপে গুণে মুগ্ধ হয়ে আমি তা' না করে পারিনি।" বেনুদেব বলল।

রূপমতী ভীষণ কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল, কি জাদু করেছিলেন?"

"সে এক সাধারণ ব্যাপার! বাঁ-হাতের বুড়ো আঙ্গুলের মাপে একটা গাজর কেটে নিয়েছিলাম। রুমাল ঢাকা দিয়ে বুড়ো আঙ্গুলের জায়গায় গাজরটা ধরেছিলাম। তোমার বাবার বেঁধান ছুঁচগুলো সব ওই গাজরের গায়ে ফুটেছিল। বুঝতেই পারছ আমি কোন কষ্ট পাইনি। তারপর ছুঁচ উপড়ে ফেলার পর আমি গাজর শুদ্ধ সেই রুমালটাকে আবার পকেটে পুরে ফেলেছিলাম। আমার এই সামান্য জাদু কেউ ধরতে পারেনি।" বেনুদেব হাসতে হাসতে বলল।

"তাহলে তো আপনি বড় অন্যায় করে-ছেন? আমার বাবাকে, আমার পরিবারের সবাইকে আপনি ঠকিয়েছেন! এর শাস্তি আপনাকে পেতেই হবে একদিন না এক-দিন!" রেগে যাওয়ার অভিনয় করে রূপমতী বলল।

"তুমি যে শাস্তি দেবে সেই শাস্তিই আমি মাথা পেতে নেব মহারাণী!" বেনুদেব বলল।

"অন্তঃপুরে আজীবন থাকার শাস্তি দিচ্ছি আপনাকে!" রূপমতী বলল।

"যথা আজ্ঞা, মহারাণী!" হাসতে হাসতে বিচিত্র অভিনয় করতে করতে বেনুদেব বলল।

যেমন কুকুর তেমনি মুগুর

এক শহরে কমলা নামে এক বিধবা ছিল। ওর সতীনের মেয়ে বিমলাও তার সঙ্গে থাকত। স্বামীর মারা যাবার পর কমলা অনেক ভেবে পেট চালানোর জন্য একটা হোটেল খুলল।

ওই শহরে লোকজন খুব বেশি যাতায়াত করত। কিন্তু খাওয়া দাওয়ার ভাল হোটেল সেখানে ছিল না। হোটেলে যারা আসত তাদের পরিবেশন করার আর তাদের ডেকে বসানোর ভার ছিল বিমলার উপর। কমলা সারাদিন বিমলাকে হোটেলের কাজেই খাটাত।

বিমলা দেখতে শুনতে ভাল ছিল। বিয়ের বয়সও হয়েছিল তার। কিন্তু কমলা বিমলার বিয়ের কোন কথাই চিন্তা করত না। কারণ বিয়ের পর বিমলা শ্বশুর বাড়ি চলে গেলে তার এই হোটেলের কাজ করবে কে।

প্রতিবেশীরা কেউ বিমলার বিয়ের কথা পাড়লে কমলা বলত, "বিমলা ছাড়া এই জগৎসংসারে আমার নিজের বলতে কে আছে? ওকে ছেড়ে আমি এক মুহূর্ত বাঁচতে পারব না। পণ দেবার ক্ষমতা নেই আমার। যারা ওকে বিয়ে করতে এগিয়ে আসবে তারা যেন পণ হিসেবে ওর সঙ্গে আমাকে নিয়ে যায়।"

কমলার এই বক্তব্য শুনে কেউ আর বিমলার বিয়ের ব্যাপারে সাহস করে এগিয়ে আসত না। বিনা পণে বিমলাকে বিয়ে করতে যদিও বা কিছু লোক আগ্রহী ছিল কিন্তু কমলার ভার নেবে কে! বিমলা বুঝতে পারল তার বিয়ে এ জীবনে আর হবে না।

অনিমা দেবী

দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়। হঠাৎ একদিন দুপুরে রামপ্রসাদ নামে এক যুবক কমলার হোটেলে এল। খাওয়া দাওয়ার পর পয়সাকড়ি দিতে দিতে সে বলল, "আমি এক যোগ্য পাত্রীর সন্ধানে আছি। আপনি কোন খোঁজ খবর দিতে পারেন?"

"আমি বাবা হোটেল ছেড়ে এক পা-ও নড়তে পারি না। আমি তোমাকে খোঁজ দেব কি!" কমলা জবাব দিল।

আশেপাশে যে মহিলারা ছিল ওরা বলল, "অমন সুন্দর মেয়ে ঘরে থাকতে মিথ্যে কথা বলছ কেন?"

"আরে ওকে বিয়ে করা কি অত সহজ?" কমলা বলল।

"অসুবিধে কোথায়?" যুবকের নাম রামপ্রসাদ। সে জিজ্ঞেস করল।

"ওকে যে বিয়ে করবে তাকে যে পণ হিসেবে আমার ভার নিতে হবে।" কমলা বলল।

"এ আর এমন কি অসুবিধা? আপনার মতো একজন থাকলে তো ভালই হয়। তাহলে আর দেরী কেন? আমার সঙ্গে বিমলার বিয়ের ব্যবস্থা করে দিন।" রাম-প্রসাদ বলল।

কমলা ভেবেছিল বিমলার বিয়ের শর্ত শুনে রামপ্রসাদ পালাবে। সে কল্পনাও করতে পারেনি যে রামপ্রসাদ এত সহজে বিয়ের ব্যাপারে রাজী হয়ে যাবে। তখন বাধ্য হয়েই কমলা রামপ্রসাদকে বলল, "বিয়ে করব বল্লেই তো আর বিয়ে হয় না বাবা! তার আগে তোমার বংশবৃক্ষের পরিচয় দাও?"

"সে আর এমন কি। আর দাওয়ারই বা এমন কি আছে! নিজের চোখেই তো দেখবেন।" রামপ্রসাদ বলল।

কমলা ভেবে পেল না কোন কথা বলে রামপ্রসাদকে এড়িয়ে যাবে। এদিকে দেখতে দেখতে প্রতিবেশীরা এসে রাম-প্রসাদের সঙ্গে বিয়ে দিতে পীড়াপীড়ি করতে লাগল। নিরুপায় হয়ে রামপ্রসাদের সঙ্গে বিমলার বিয়ে দিতে হল।

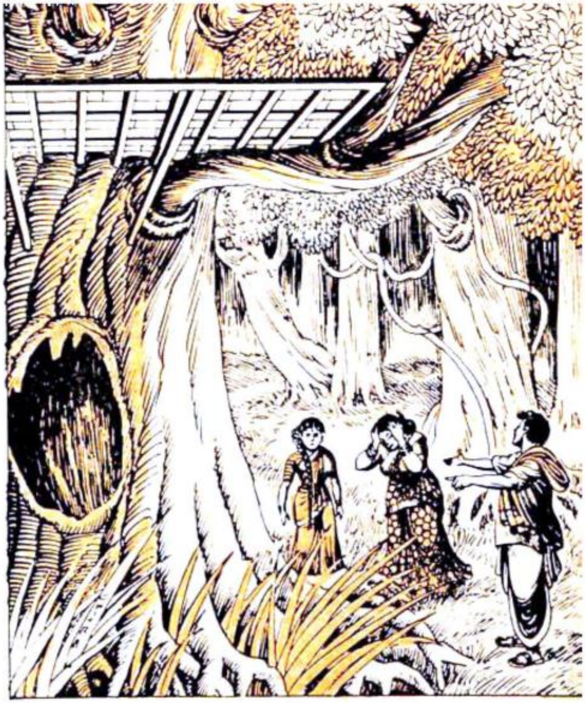

বিয়ের পরের দিন বউকে নিয়ে ফিরতে চাইল রামপ্রসাদ। সমস্ত গয়নাগাটি পরে, টাকাপয়সা নিয়ে নবদম্পতির সঙ্গে কমলাও বেরিয়ে পড়ল। হোটেলে তালা লাগিয়ে দিল।

রামপ্রসাদ তার বাড়ি কাছেই আছে বলে সারা পথ হাঁটিয়ে নিয়ে এল। অনেক-দূর হাঁটার ফলে কমলা ক্লান্ত হয়ে রেগে গিয়ে বলল, "তোমার বাড়ি আর কত দূর বাবা? কোন বন বাদাড়ে নিয়ে যাচ্ছ আমাদের?"

"এই এসে গেছি। আর একটু।" রামপ্রসাদ বলল।

সন্ধ্যে নাগাদ সে একটা বনের ভেতরে নিয়ে গেল ওদের। সেই বনের এক বিরাট বট গাছের সামনে দাঁড়িয়ে তার উপরের একটি মাচা দেখিয়ে রামপ্রসাদ বলল, "এই আমার আস্তানা। আর আপনি যে বংশবৃক্ষের কথা বলছিলেন এটাই সেই বংশবৃক্ষ। আমার বাপঠাকুর্দা এখানেই জন্মেছে, এখানেই মরেছে।"

"ওরে পাজী, নচ্ছার কোথাকার। তুমি বলেছিলে তোমার বংশবৃক্ষ বিরাট বড়। আমি ভেবেছিলাম তুমি খুব বড় পরিবারের ছেলে। তুমি শেষে কিনা আমার মত অবলাকে এইভাবে ধোকা দিলে?" কমলা ভীষণ রেগে গিয়ে বলল। কিন্তু বিমলা নীরব রইল। এদিকে ক্রমশঃ অন্ধকার হয়ে এল। বনের জন্তু জানোয়ারদের ডাক শোনা গেল। ক্রমশঃ পরিবেশ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছিল। কমলা ভাবল আজকের রাতটা কোন রকমে কেটে গেলে কালকে একটা ব্যবস্থা করতে হবে। এসব ভেবে সে রামপ্রসাদকে বলল, "দেখো বাবা, আজকের রাতটা আমাকে নীচে ফেলে রেখ না। শেষে কি বাঘের পেটে যাবো? তুমি আমাকে মাচায় তুলে দাও।"

"দেখুন, আপনার এই বিশাল দেহ আমি মাচায় তুলি কি করে? আর তুললেও আমার বংশবৃক্ষ ভেঙ্গে পড়বে। আপনি বরং এই গাছের ফুটোর মধ্যে ঢুকে কোন-

রকমে আজকের রাতটা কাটিয়ে দিন। এসব গাছের গর্তে বাঘ ভালুক ঢুকতে ভয় পায়।” রামপ্রসাদ কমলাকে বলল।

কমলা ভয়ে কাঠ হয়ে ঐ গাছের গর্তে ঢুকে গেল। মনে মনে ঠিক করল সাত-সকালে উঠে নিজের হোটেলে পালাবে। বিমলার ভাগ্যে যা আছে তাই হবে!

ঢুকল বটে কিন্তু ঘুম হল না। ভোর রাত্রে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগায় হঠাৎ তার গভীর ঘুম পেয়ে গেল। হঠাৎ তার মনে হল কে যেন তাকে টানছে। চোখ খুলে দেখে ভালুক তাকে টানছে। তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে সে মূর্চ্ছা গেল। তার আর্তনাদের ভয়ঙ্কর আওয়াজ শুনে ভালুক তাকে ছেড়ে চলে গেল।

রামপ্রসাদ মাচা থেকে নেমে এসে বলল, “কি হল, চিৎকার করছেন কেন?”

“কি করব বাবা? তোমার যে এমন সুন্দর বাড়ি আছে তা' যদি আগে জানতাম! ভালুকে টান দিলে কি আর চিৎকার না করে পারি? আর বাবা এক মুহূর্তও এখানে থাকতে চাই না। বিমলার ভাগ্যে যা' আছে তাই হবে। আমি আর ওকে নিয়ে ভাবতে চাই না।” বিমলা তখনও একটি কথাও বলল না। রামপ্রসাদ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, “তাকি হয়? আপনি তো আমার পণে পাওয়া। এমনি আপনাকে ছাড়া যায়?” তার কথা শুনে কমলার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে এল। “বেশ এসব গয়না-গাটি টাকাপয়সা তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি। আমাকে ছেড়ে দাও বাবা।” বলে কমলা বিমলার হাতে সব দিয়ে ফিরে গেল।

তারপর রামপ্রসাদ বিমলাকে নিয়ে নিজের বাড়ি ফিরে গেল। বাড়িতে ঢুকেই বিমলা দেখল দেয়ালে ভালুকের চামড়া হরিণের মুখ প্রভৃতি রয়েছে। বুঝল তার স্বামী শিকারী। আর এও বুঝল তার বিমাতাকে ভালুক সেজে কে টান দিয়েছে!

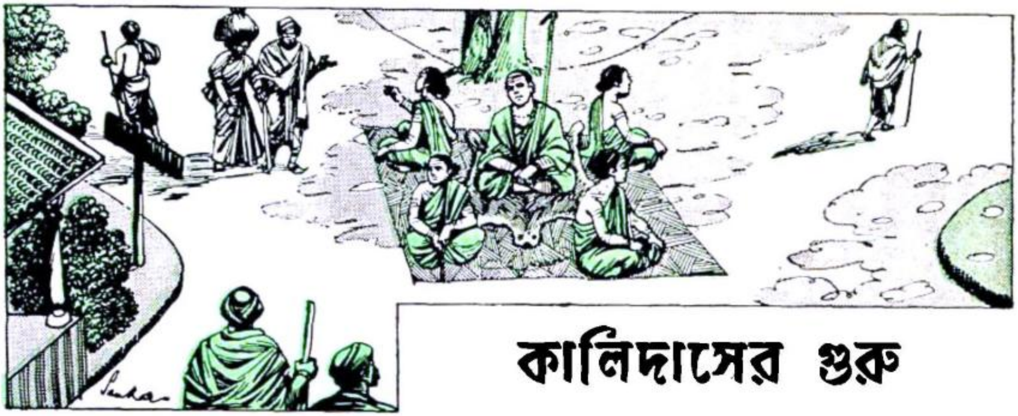

কালিদাসের গুরু

ভোজরাজের দরবারে বিষ্ণুশর্মা নামে এক পণ্ডিত ছিলেন। কালিদাসকে উনি দুচক্ষে দেখতে পারতেন না। সব সময় চেষ্টা করতেন কালিদাসকে অপমান করতে। তার নিজের অপমান করার সাহস ছিল না। অন্য কাউকে দিয়ে অপমান করানোর চেষ্টা করতেন।

একদিন বিষ্ণুশর্মার কাছে এক মূর্খ ব্রাহ্মণ এসে বলল, "মশাই আমি এক গরিব ব্রাহ্মণ। লেখাপড়া জানিনা। আপনি কোনও রকমে আমাকে রাজার দর্শন করিয়ে আমার এই দরিদ্র অবস্থা যাতে ঘুচে যায় তার ব্যবস্থা করুন। আমি সারা জীবন আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।"

বিষ্ণুশর্মা ভাবলেন, এরকম একটা মূর্খ ব্রাহ্মণকে দিয়ে কালিদাসকে যদি অপমান করানো যায় তাহলে খুব ভাল হয়। একথা ব্রাহ্মণকে বললেন, "তুমি তো লেখাপড়া জাননা, দরবারে ঢুকবে কি করে? তুমি এক কাজ কর চার পাঁচজন শিষ্য যোগাড় করে আমি যখন ডাকব সোজা সন্ন্যাসীর বেশে চলে আসবে। পথে যদি তোমাকে কেউ জিজ্ঞেস করে তুমি সোজা বলবে, 'আমি কালিদাসের গুরু।' এমন কি ভোজ রাজা জিজ্ঞেস করলেও তুমি একই কথা বলবে। তখন রাজা তোমাকে কোন প্রশ্ন না করেই প্রচুর পুরস্কার দিয়ে বিদেয় করবেন।"

বিষ্ণুশর্মার কথানুযায়ী ঐ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা করতে লাগল। যাত্রীরা কেউ প্রশ্ন করলে শুনতে পেত, "আমি কালিদাসের গুরু।"

জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

বাতাসের বেগে রাজধানীতে কালিদাসের গুরুর আগমণের কথা ছড়িয়ে পড়ল। ঘুরতে ঘুরতে কথাটা কালিদাসের কানেও গেল। কালিদাস বুঝতে পারলেন যে এসব কাজ বিষ্ণুশর্মার পরামর্শ অনুযায়ী হচ্ছে। সুযোগ বুঝে এর সমুচিত জবাব দেবার অপেক্ষা করছিলেন কালিদাস। এতবড় খবর রাজার কানে না পৌঁছে পারে না। রাজা কালিদাসকে বললেন, "মহাকবি, শুনতে পেলাম আপনার গুরু রাজধানীতে আগমন করেছেন, আপনি তাঁর দর্শন পাননি?"

"আমি তাঁর দর্শনের অপেক্ষায় আছি।" একথা বলে কালিদাস সেদিন রাতের অন্ধকারে ঐ নকল সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা করে তাকে বললেন, "ওহে ব্রাহ্মণ, তুমি এসব করছ কেন? কিসের জন্য এত কাণ্ড করে যাচ্ছ? কি লাভ?"

ব্রাহ্মণ যখন জানতে পারল যে সে মহাকবি কালিদাসের সঙ্গে কথা বলছে, তখন সে খুব ঘাবড়ে গিয়ে বলল, "মহাকবি আমাকে ক্ষমা করুন। কিছু অর্থের লোভে আমি বিষ্ণুশর্মার পরামর্শে এসব করছি।"

ব্রাহ্মণের কথা শুনে কালিদাস দুঃখ পেয়ে বললেন, "ওহে ব্রাহ্মণ অর্থ সংগ্রহের বহু উপায় আছে। তুমি যদি কিছু অর্থ যোগাড় করতে পার তাতে আমি খুশীই হব। কিন্তু এদিকে একটা মুস্কিল হয়েছে। রাজা জেনে গেছেন যে আমার গুরু রাজধানীতে এসেছেন। উনি নিশ্চয় তোমাকে ডেকে পাঠাবেন। উনি তোমাকে কোন প্রশ্ন না করে যদি উপহার দেন ভাল কথা। আর যদি কোন প্রশ্ন করেন, তখন তুমি আমার দিকে তাকাবে। আমি যাহোক একটা বলে রাজাকে খুশী করব।"

কালিদাসের অনুমান অনুসারে পরের দিন পাল্‌কী পাঠিয়ে রাজা কালিদাসের গুরুকে ডেকে পাঠালেন।

চারজন শিষ্যকে নিয়ে ঐ ব্রাহ্মণ রাজ দরবারে ঢুকল। রাজা ভোজ স্বাগত জানিয়ে আসনে বসালেন।

তারপর রাজা ভোজ কালিদাসের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি আপনার গুরুকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই।"

"অবশ্যই করবেন মহারাজ। উনি সমস্ত বিষয়ে সুপণ্ডিত।" কালিদাস বললেন।

ঐ ব্রাহ্মণের দিকে ফিরে রাজা ভোজ বললেন, "হে মহানুভব আপনাকে যে প্রশ্ন করব তা যদি সরল প্রশ্ন হয় তার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। লঙ্কার অধিপতি দশকণ্ঠের নাম রাবণ। রাবণ নামের অনেক কারণ আছে শুনেছি। আপনি দয়া করে রাবণ শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্দ্ধারণ করুন।"

কালিদাসের গুরুর কাছ থেকে জবাব শোনার জন্য রাজসভার প্রত্যেকে কান খাড়া করে রইল।

ব্রাহ্মণ কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থেকে বলল, "ও ঐ রাভণ?"

রাভণ শব্দটি শুনে রাজসভার প্রত্যেকে অবাক হয়ে গেল। তখন রাজা প্রশ্ন করলেন, "হে মহাপণ্ডিত, প্রত্যেকে রাবণ বলে আর আপনি রাভণ বলছেন কেন?"

তখন একটু সাহস সঞ্চয় করে কালিদাসের দিকে তাকিয়ে ব্রাহ্মণ বলল, "আমার শিষ্য এর জবাব দেবে।"

রাজা ভোজ কালিদাসের দিকে তাকালেন। কালিদাস তখন বললেন,

"ভকারঃ কুম্ভকর্ণে চ,
ভকারশ্চ বিভীষণে;
তয়োজ্যেষ্ঠ, কুলশ্রেষ্ঠ
ভকার কিম ন বিদ্যতে?"

[কুম্ভকর্ণের নামে আছে ভকার, বিভীষণের নামেও আজে ভকার। তাহলে এই দুজনের চেয়ে যে বড় এবং কুলশ্রেষ্ঠ রাবণ তার নামে কেন ভকার থাকবে না?]

এই জবাব শুনে রাজা ভোজ প্রসন্ন হলেন। ঐ মূর্খ ব্রাহ্মণকে এক লক্ষ মুদ্রা দিয়ে বিদায় করলেন। এর ফলে পরক্ষে বিষ্ণুশর্মাই অপমানিত হলেন।

অপমানের বদলা

মারোয়াড় রাজ্যের রাজধানী ছিল মাণ্ডু। রাজার নাম জয়দেব। একদিন রাজ-সভায় এক চারণকবি এসে রাজা জয়দেবের খুব প্রশংসা করল দীর্ঘ এক কবিতার মাধ্যমে।

সাধারণভাবে কোন ভাট অথবা চারণকবি এসে রাজাকে প্রশংসা করে কোন কবিতা রচনা করে শোনালে তাদের অনেক দামী উপহার দেওয়া হয়। জয়দেবের মধ্যে কবিত্ব ছিল, ছিল এক সুকোমল কবি মন। চারণকবিদের প্রতি তাঁর আস্থা কোনদিনই ছিল না। ওদের তিনি উপহার দেওয়া একেবারেই পছন্দ করতেন না। উপরন্তু তিনি ওদের নানান কথার মাধ্যমে যুক্তিতে ও বুদ্ধিতে পরাস্ত করে লজ্জা দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিতেন।

চারণকবি মনে মনে রাজাকে অভিশাপ দিয়ে হাড়বংশী রাজাদের রাজধানী বুয়োডায় চলে গেল। গিয়ে জানল যে সেখানকার রাজা আল্‌হা শিকার করতে গেছেন। সে দরজার কাছে রাজার আগমনের প্রতীক্ষায় বসে রইল।

যথাসময়ে রাজা ফিরলেন। তাকে দেখেই চারণকবি তার কাছে ছুটে গিয়ে বলল, "রাজমার্তণ্ড, রাজাধিরাজ, জয়ী ভব, দিগ্বিজয়ী ভব।"

রাজা ভাবলেন চারণকবি যখন এত ভাল ভাল কথা বলছে তখন নিশ্চয়ই সোনাদানা অথবা কোন গ্রাম দান করতে বলবে। কিন্তু চারণকবি ওসব কিছুই না চেয়ে বলল, "মহারাজ, আমাকে আপনার পাগড়ী দান করুন।"

শুবীর পাহাড়ী

রাজা বললেন, "তুমি কি পাগল হয়েছ? পাগড়ী দিয়ে তুমি কি করবে? পাগড়ী কি তোমাকে খেতে পরতে দেবে? জমি জায়গা চাইলে বুঝি! কাপড় নিয়ে কি করবে?"

"মহারাজ, আপনার পাগড়ী মাথায় বেঁধে আমার ঘুরে বেড়ানোর খুব ইচ্ছে করছে। আমি সব জায়গায় আপনার নাম করব। আপনি দয়া করে আমাকে আপনার পাগড়ী দান করুন।" চারণকবি বলল।

রাজা কিছুক্ষণ ভেবে মাথার পাগড়ী খুলে চারণকবির হাতে দিল। সেই পাগড়ী মাথায় বেঁধে চারণকবি সভা থেকে বেরিয়ে গেল। তার এই আচরণ দেখে সভার সকলে চারণকবিকে পাগল ভাবল।

কিছুদিন কেটে গেল। কবি আর পাগড়ীর কথা সবাই ভুলে গেল। একদিন হঠাৎ আল্‌হা রাজার কাছে ওই চারণকবি এসে পাগড়ীটা তাঁর সামনে রেখে হাউ মাউ করে কাঁদতে লাগল।

"কাঁদছ কেন কবি? কি হয়েছে?" রাজা জিজ্ঞেস করলেন।

"কি বলব মহারাজ, আমার জন্য আপনার খুব অপমান হয়েছে!" চারণকবি ভারী গলায় বলল।

"কি হয়েছে বলত?" রাজা বললেন।

"আমি আপনার পাগড়ী জড়িয়ে অনেক দেশে ঘুরেছি। বহু রাজার সঙ্গে দেখা করে কবিতা শুনিয়েছি। ওঁদের সামনে

ডান হাতে আপনার পাগড়ী ধরে বাঁ হাতে ওদের নমস্কার করেছি। আমার এই আচরণ দেখে রাজারা আমাকে প্রশ্ন করলে আমি বলতাম, এটা মহারাজা আল্হার পাগড়ী। এই পাগড়ী পরা অবস্থায় আমি আপনাদের সামনে মাথা নত করতে পারি না। কারণ আল্হা রাজা কারও কাছে মাথা নত করেন না।" চারণকবি বলল।

কবির কথা শুনে রাজসভার প্রত্যেকে খুশী হল। তাদের খুশী হতে দেখে কবি আবার বলল, "কিন্তু মহারাজ, শেষ পর্যন্ত আমি আপনার সম্মান রাখতে পারিনি। মারোয়াড়ের রাজা জয়দেবের দরবারে আপনার পাগড়ীর চরম অপমান হয়েছে। অন্য রাজার কাছে যা করেছিলাম জয়দেবের সামনেও তাই করলাম। কারণ জিজ্ঞাসা করলে একই জবাব দিয়েছিলাম। কিন্তু আমার জবাব শুনে রাজা সোজা সিংহাসন থেকে নেমে, আপনার প্রশংসা করার পরিবর্তে, আমার হাত থেকে পাগড়ী কেড়ে নিয়ে লাথি মেরে আমাকে চড় চাপড় মেরে রাজসভা থেকে ভাগিয়ে দিল।"

চারণকবির কথা শুনে রাজসভার প্রত্যেকে রাগে জ্বলতে লাগল। ওরা এক সঙ্গে বলে উঠল, "এটা আমাদের রাজার অপমান। আমাদের জয়দেবকে এর সমুচিত শিক্ষা দেওয়া উচিত।" এসব কথা শুনে এক বৃদ্ধ বললেন, "ছোট একটা কাপড় নিয়ে একটা রাজার বিরুদ্ধে যাওয়া কি ঠিক হবে?" কিন্তু তার কথায় কেউ কান দিল না।

আল্হা রাজা সেনাবাহিনী নিয়ে জয়দেবের প্রাসাদ ঘিরে ফেলল। অতর্কিত আক্রমণে রাজা জয়দেব ঘাবড়ে গেলেন। ফলে তাঁর পরাজয় হল। মাণ্ডু আল্হা রাজার দখলে এল।

তারপর জয়দেবের উপর চারণকবির রাগ জল হয়ে গেল।

ঐতিহাসিক

মহেন্দ্রগিরির রাজা ছিলেন পুরন্দর। তিনি যে কেবল সুনিপুণভাবে রাজ্য শাসন করতেন তাই নয় গুণী লোককে সম্মানিতও করতেন। রাজ কাজ করে যখনই অবকাশ পেতেন তখনই তিনি বিভিন্ন গুণী ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতেন ও তাদের সম্মানিত করতেন।

একবার পুরন্দরের রাজসভায় এক বিদেশী এলেন। তাঁর নাম শ্রীকণ্ঠ। ইতিহাস লেখা ছিল তাঁর পেশা। উনি এক এক দেশে এক বছর করে থাকতেন আর সেই দেশের ভাষা ও আচার বিচার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে সেই দেশের ইতিহাস রচনা করতেন। এইভাবে উনি চোদ্দটি দেশ ঘুরে চোদ্দটি ভাষা শিখে চোদ্দটি ইতিহাস রচনা করে এলেন মহেন্দ্রগিরিতে।

এহেন এক পণ্ডিতের আগমনে খুশী হলেন রাজা পুরন্দর। রাজা বললেন, "আমার দেশেও এক বছর থেকে আপনি আমাদের দেশের ইতিহাস রচনা করুন। আপনার থাকা খাওয়ার সুব্যবস্থা করব।"

"তা থাকতে পারি তবে এই এক বছর আমাকে আপনি যদি আপনার সঙ্গেই রাখেন তাহলে আমার পক্ষে ইতিহাস লেখার কাজ সহজ হবে।" শ্রীকণ্ঠ বললেন।

পুরন্দর এই প্রস্তাবে রাজী হলেন। শ্রীকণ্ঠ রাজার সঙ্গে যুদ্ধে যেতেন, শিকারে যেতেন, এমন কি ঘুরে বেড়াতেও যেতেন। বেড়ানোর সময় শ্রীকণ্ঠ প্রজাদের সঙ্গেও কথাবার্তা বলতেন। ক্রমে ক্রমে রাজ্যের প্রায় সবাই জেনে গেল যে শ্রীকণ্ঠ রাজার অন্তরঙ্গ। ফলে লোকে শ্রীকণ্ঠকে খাতির

বি. রাগা

করতে লাগল। ধনী ও ব্যবসাদার লোক শ্রীকণ্ঠকে যখন তখন সাদরে অভ্যর্থনা জানাত ও তাঁকে ভাল ভাল জিনিস খাওয়াত। তাদের ধারণা রাজার অন্তরঙ্গকে খুশী করলে বিশেষ সুবিধা আদায় করা যাবে।

শ্রীকণ্ঠের মহেন্দ্রগিরিতে অবস্থান কাল প্রায় শেষ হয়ে এল। ইতিহাস রচনাও শেষ হয়ে এল। শেষে একদিন রাজা পড়তে চাইলেন শ্রীকণ্ঠের রচিত ইতিহাস। তাতে মহেন্দ্রগিরির আচার বিচার, প্রজাদের প্রতি রাজাদের ব্যবহার, রাজা ও রাজ-দরবারের লোকের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস, একের অন্যের প্রতি সহযোগিতার মনোভাব প্রভৃতির বিষয়ে সুন্দর বর্ণণা রয়েছে। কিন্তু ঐ ইতিহাসের একটি জায়গায় লেখা ছিল ঃ এই দেশের মানুষ সহজ সরল প্রকৃতির। রাজাকে বলা চলে ধর্মাত্মা। রাজার প্রতি রাজকর্মচারিদের অগাধ ভক্তি ও শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু এই শহরের ব্যবসাদাররা অত্যন্ত লোভী ও অর্থের পিশাচ। তারা দেশবাসীকে দিনের পর দিন ঠকাচ্ছে।"

ইতিহাসের এই অংশ রাজার পছন্দ হল না। রাজা শ্রীকণ্ঠকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, "মহাপণ্ডিত, আপনার ইতিহাস আমি পড়েছি। ভুল বের করার কিছু নেই। তবে আপনি লিখেছেন যে শহরের ব্যবসাদাররা অত্যন্ত লোভী ও অর্থের পিশাচ। তারা দেসবাসীকে ধোকা দিচ্ছে।

এটা কার্যত অসত্য। মিথ্যে কথা। আমি জানি তাদের।"

আমার লেখার মধ্যে কোন ভুল থাকলে ক্ষমা করবেন। আমার যাবার আগে আমি ঐ ভুলগুলো শুধরে নেব।" বললেন শ্রীকণ্ঠ।

একথা শুনে রাজা খুব খুশী হলেন। পরের দিন শ্রীকণ্ঠ শহরের ধনী ও ব্যবসা-দারদের সঙ্গে দেখা করে বললেন, "রাজা ভেট চাইছেন। আপনাদের কাছে দামী হিরে মুক্তো যা আছে দিন আর তার একটি তালিকাও দিন।" শ্রীকণ্ঠ ধনীদের কাছ থেকে তালিকা নিলেন। ধনীরা রাজার অন্তরঙ্গ হিসেবে শ্রীকণ্ঠকে বিশ্বাস করে তালিকা ও হীরে মুক্তো ও সোনাও দিয়ে দিল। শ্রীকণ্ঠ ব্যবসাদার ও ধনীদের স্বাক্ষরও নিলেন ঐ তালিকার নিচে।

পরের দিন শ্রীকণ্ঠ পালিয়েছে বলে শহরে প্রচার হয়ে গেল। ধনী ও ব্যবসা-দাররা ছুটে গেল রাজার কাছে। ওদের কাছ থেকে শ্রীকণ্ঠ রাজার নাম করে কি কি নিয়ে গেছে তার তালিকা দেখিয়ে রাজাকে ওরা বলল, "মহারাজ, আপনি ধর্মাত্মা। আমাদের যা ক্ষতি হল তা ফেরত দেওয়া আপনার কর্তব্য।" বলে ওরা যেন দুঃখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে লাগল।

রাজা পুরন্দর ভাবলেন, "আমি কোন কিছু না বলতেই যখন আমার নাম করে সংগ্রহ করেছেন ঐ পণ্ডিত তখন সত্যি

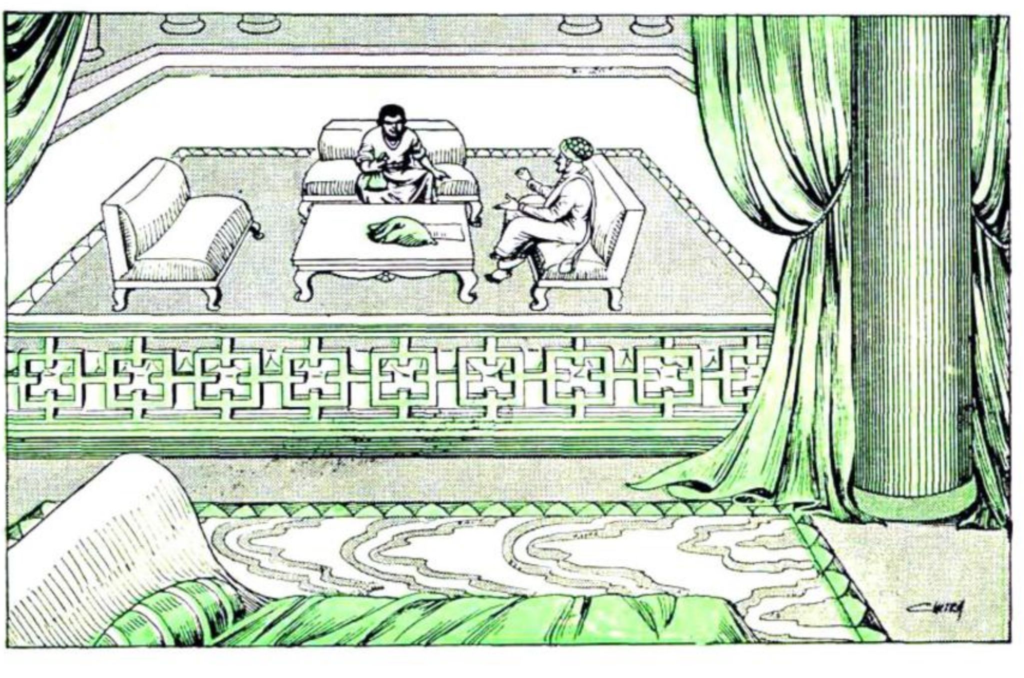

শ্রীকণ্ঠ ধোকা দিয়ে পালিয়েছে। রাজা খাজাঞ্চীকে নির্দেশ দিলেন ওদের তালিকা গুলো নিয়ে হিসেব করতে। হিসেব করে দেখা গেল ধনী ও ব্যবসাদাররা যেসব তালিকা দিয়েছে তা পূরণ করার মত অর্থ রাজকোষে নেই। একথা জেনে রাজা ভীষণ চিন্তায় পড়লেন। কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না।

এমন সময় শ্রীকণ্ঠ এক বিরাট থলি নিয়ে রাজদরবারে হাজির হলেন। সেই থলি রাজার সামনে রেখে তালিকার তাড়া রাজার হাতে দিয়ে শ্রীকণ্ঠ বললেন, "মহা-রাজ, এই তালিকা মিলিয়ে আপনি যার জিনিস তাকে দিয়ে দিন।"

শ্রীকণ্ঠকে দেখে ধনী ও ব্যবসায়ীদের গলা শুকিয়ে গেল। রাজার কোন কিছু করার আগে ওরা রাজার সামনে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়ে বলল, "মহারাজ, শ্রীকণ্ঠ পালিয়ে গেছে শুনে আমরা অনেক বাড়িয়ে তালিকা বানিয়ে আপনাকে দিয়েছি। লোভে পড়ে আমরা এই অপকর্ম করেছি মহারাজ। আপনি আমাদের ক্ষমা করুন।"

রাজা পুরন্দর ওদের ক্ষমা করলেন না। ঐ সমস্ত হীরে, মুক্তো ও সোনা রাজকোষে জমা করে ওদের ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। তারপর রাজা শ্রীকণ্ঠকে বললেন, "মহা-পণ্ডিত, আপনার রচিত ইতিহাসে কোন ভুল নেই। কোন মিথ্যা কথা নেই। আপনার কথা যে সত্য তা প্রমাণ করার জন্য আপনি যে পরিশ্রম করেছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ থাকব।"

সত্য প্রমাণ করার জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হয়। এও এক কলা। এই কলা ছাড়া ইতিহাস রচনা করা যায় না।" শ্রীকণ্ঠ বললেন।

তারপর রাজার কাছ থেকে অনেক পুরস্কার পেয়ে শ্রীকণ্ঠ অন্য দেশে চলে গেলেন।

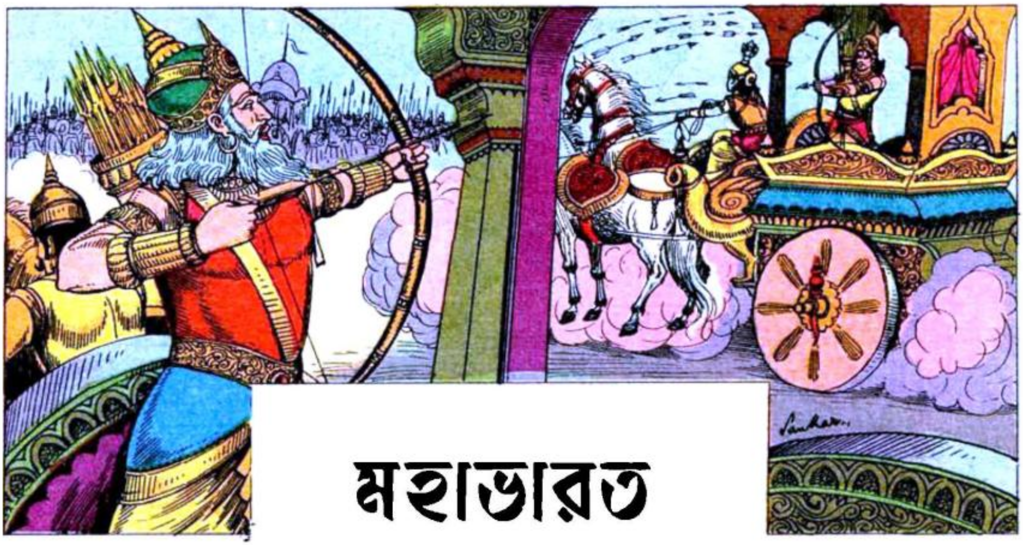

মহাভারত

কৌরব সেনারা ভীষ্মকে সামনে রেখে আর ভীমকে সামনে রেখে পাণ্ডব সৈন্যদল পরস্পরকে আক্রমণ শুরু করল। সিংহনাদ, কোলাহল, ভেরী মৃদঙ্গ নানারকম বাজনা এবং হাতী ও ঘোড়ার রবে রণক্ষেত্র ছেয়ে গেল।

সবার আগে মহাবাহু ভীমসেন বৃষভের মত গর্জন করতে করতে কৌরব সেনাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর গর্জনে অন্য সমস্ত নিনাদ মোহাচ্ছন্ন হয়ে গেল।

দুর্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি দ্বাদশ ভ্রাতা ও ভূরিশ্রবা ভীষ্মকে ঘিরে রইলেন। দ্রৌপদীর পাঁচ ছেলে, অভিমন্যু, নকুল, সহদেব ও ধৃষ্টদ্যুম্ন বাণ নিক্ষেপ করতে করতে দুর্যোধনদের সামনে এগিয়ে এলেন। তখন উভয় দলের রাজারা পরস্পরকে আক্রমণ করলেন।

ভীষ্ম নিজে তাঁর যমদণ্ডতুল্য কার্মুক নিয়ে গাণ্ডীবধারী অর্জুনের সাথে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

সাত্যকি প্রবল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর প্রতিপক্ষ কৃতবর্মার বিরুদ্ধে।

এইভাবে পরাক্রমশালী অভিমন্যু ও কোশলরাজ বৃহদবল, মরণপণ প্রতিজ্ঞাকারী যোদ্ধা ভীমসেন ও দুর্যোধন একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে লাগলেন। নকুল ও দুঃশাসন, সহদেব ও দুর্যোধন ভ্রাতা দুর্মুখ, যুধিষ্ঠির আক্রমণ করলেন মদ্ররাজ শল্যকে,

উলূক এঁদের পরস্পরের মধ্যে তুমুল দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ হতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরেই যুদ্ধক্ষেত্রে আর শৃঙ্খলা রইল না। সকলেই উন্মত্তের মত জানপ্রাণ দিয়ে যুদ্ধ করতে লাগল। পিতা পুত্র ভ্রাতা মাতুল ভাগিনেয় বন্ধু আত্মীয় স্বজন কেউ যেন কাউকে চিনতে পারছেন না। পাণ্ডবেরা ভূতাবিষ্টের মতই কৌরবদের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

অভিমন্যুর শরাঘাতে ভীষ্মের স্বর্ণখচিত রথধ্বজ ছিন্ন হয়ে মাটিতে লুটাতে লাগল। ভীষ্ম অভিমন্যুকে শরজালে ঢেকে ফেল-লেন। অভিমন্যুর এই অবস্থা দেখে ভীমসেন সাত্যকি এঁরা অভিমন্যুকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলেন। বিরাটপুত্র উত্তর একটি প্রকাণ্ড হাতীতে চড়ে প্রবল বিক্রমে শল্যকে আক্রমণ করলেন। সেই বিশাল-দেহ হাতীর পায়ের চাপে ও আঘাতে শল্যের রথের চারটি ঘোড়া বিনষ্ট হল। তখন শল্য ক্রোধান্বিত হয়ে ভুজঙ্গতুল্য শক্তি-অস্ত্র উত্তরের উপর নিক্ষেপ করলেন। সেই অস্ত্রের আঘাতে বিরাটপুত্র উত্তর প্রাণ হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। উত্তরকে নিহত দেখে বিরাটের অন্য পুত্র ও সেনাপতি শ্বেত প্রচণ্ডভাবে শল্যকে আক্রমণ করলেন। তাঁদের শরাঘাতের জ্বালায় শল্য নিরুপায় হয়ে কৃতবর্মার রথে

ধৃষ্টদ্যুম্নের সাথে দ্রোণের, বিরাটপুত্র শঙ্খ ও ভূরিশ্রবা, ধৃষ্টকেতু ও বাহ্লিকের সঙ্গী, ঘটোৎকচ ও অলম্বুস রাক্ষস, শিখণ্ডী ও অশ্বত্থামা, বিরাট ও ভগদত্ত, কেকয়রাজ বৃহৎক্ষত্র ও কৃপাচার্য, রাজা দ্রুপদ এবং সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের মধ্যে। ভীমের পুত্র সুতসোম ও দুর্যোধন ভ্রাতা বিকর্ণ, চেকিতান ও সুশর্মা, যুধিষ্ঠিরপুত্র প্রতিবিন্ধ্য ও শকুনি, অর্জুন-সহদেবপুত্র শ্রুতকর্মা-শ্রুতসেন ও কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, অর্জুনপুত্র ইরাবান ও কলিঙ্গরাজ শ্রুতায়ু, কুন্তিভোজ ও বিন্দ-অনুবিন্দ, বিরাটরাজের পুত্র উত্তর ও দুর্যোধনভ্রাতা বীরবাহু প্রচণ্ড যুদ্ধ করতে লাগলেন। চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু ও শকুনিপুত্র

উঠে বসলেন। শল্যপুত্র রুক্মরথ এবং বৃহদ্‌বল প্রভৃতি অন্যান্য ছজন বীর শল্যকে ঘিরে রইলেন। অনিশ্চিত অবস্থার আশঙ্কায় তাদের চোখ মুখের চেহারা বদলে গিয়েছিল। শ্বেতের শরাঘাতে শত শত সৈনিক নিহত হতে লাগল। তাই দেখে ভীষ্ম তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন। তারপর ভল্লের আঘাতে শ্বেতের ঘোড়া ও সারথিকে বধ করলেন। তখন রথ থেকে নেমে শ্বেত ভীষ্মের প্রতি শক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। ভীষ্মের শরাঘাতে শ্বেতের শক্তি অস্ত্র ছিন্ন হয়ে গেল। তখন শ্বেত গদার আঘাতে ভীষ্মের রথ, অশ্ব ও সারথি বিনষ্ট করলেন। তারপর ভীষ্ম এক মন্ত্রসিদ্ধ বাণ মোচন করলেন জ্বলন্ত অশনির মত সেই বাণ শ্বেতের বর্ম ও হৃদয় ভেদ করে মাটিতে গেঁথে গেল। নর-শার্দূল শ্বেতের মৃত্যুতে পাণ্ডবদলের ক্ষত্রিয়গণ শোকাতুর হলেন। ঘোর বাদ্যধ্বনির সাথে দুঃশাসন নাচতে লাগল।

কৌরবদের মধ্যে যুদ্ধ জয়ের আনন্দের জোয়ার এল। বড় বড় যোদ্ধারা আনন্দে নাচতে লাগল। একে অন্যের পিঠ চাপড়াতে লাগল। একে অন্যের বীরত্বের প্রশংসা করতে লাগল। পাণ্ডবদের চিৎকার করে নিন্দে করতে লাগল। কৌরব যোদ্ধাদের এই আনন্দের উচ্ছ্বাস, এই উল্লাসপূর্ণ নৃত্য ও গীত সাধারণ সেনাদের

মধ্যেও মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ল। তারাও আনন্দে নাচতে লাগল।

এর বিপরিত অবস্থা হল পাণ্ডবদের মধ্যে।

তারপর সূর্য অস্ত গেল। পাণ্ডবগণ সৈন্যদের নিবৃত্ত করলেন। দুই দলের যুদ্ধ বিরাম ঘোষণা করা হল।

তারপর সেনাদের যে যার শিবিরে ফিরে যাওয়ার পালা। কোন রকমে রাতটুকু ঘুমিয়ে বিশ্রাম করে পরের দিন প্রবল বিক্রমে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

ভীষ্ম যে প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করলেন তা দেখে দুর্যোধন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন।

প্রথম দিনে যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির শোকে কাতর হয়ে কৃষ্ণকে বললেন, "ভীষ্ম যেভাবে আমাদের সৈন্য ধ্বংস করছেন তাতে যম ইন্দ্র বরুণ ও কুবেরকেও জয় করা যায়। কিন্তু ভীষ্মকে জয় করা অসম্ভব। কেশব, আমি বুদ্ধির ভুলে ভীষ্মরূপ অগাধ জলে ডুবতে বসেছি। আমি বনে চলে যাব সেও ভাল কিন্তু ভীষ্মের কবলে আমার বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় স্বজন এবং নরপতিগণকে ফেলতে চাই না। বল মাধব কিসে আমার মঙ্গল হবে। আমি দেখছি অর্জুন যুদ্ধে নীরব ও উদাসীন হয়ে আছেন। একমাত্র ভীমই ক্ষত্রধর্ম স্মরণ রেখে প্রাণপণ যুদ্ধ করছেন। ভীষ্ম আমাদের সেনাদের দাবানলে পোড়ানোর মত পুড়িয়ে মেরেছেন। গদার আঘাতে শত্রু সৈন্য, রথ, অশ্ব ও হাতী বিনষ্ট করছেন। কিন্তু এই সরল যুদ্ধে শত শত হাজার বছরেও ভীম শত্রুসেনা ক্ষয় করতে পারবেন না।"

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিতে দিতে বললেন, "ভরতশ্রেষ্ঠ, আপনার শোক করা মোটেই উচিত নয়। আমি মহারথ সাত্যকি, বিরাট ও দ্রুপদ সকলেই মঙ্গলাকাঙ্খী। এই রাজারা এবং তাঁদের সৈন্যদল সকলেই আপনার ভক্ত, আপনাকে শ্রদ্ধা করে। আর এটাও সত্যি যে ভীষ্মের মৃত্যুর কারণ হবেন শিখণ্ডী। ভীষ্মকে

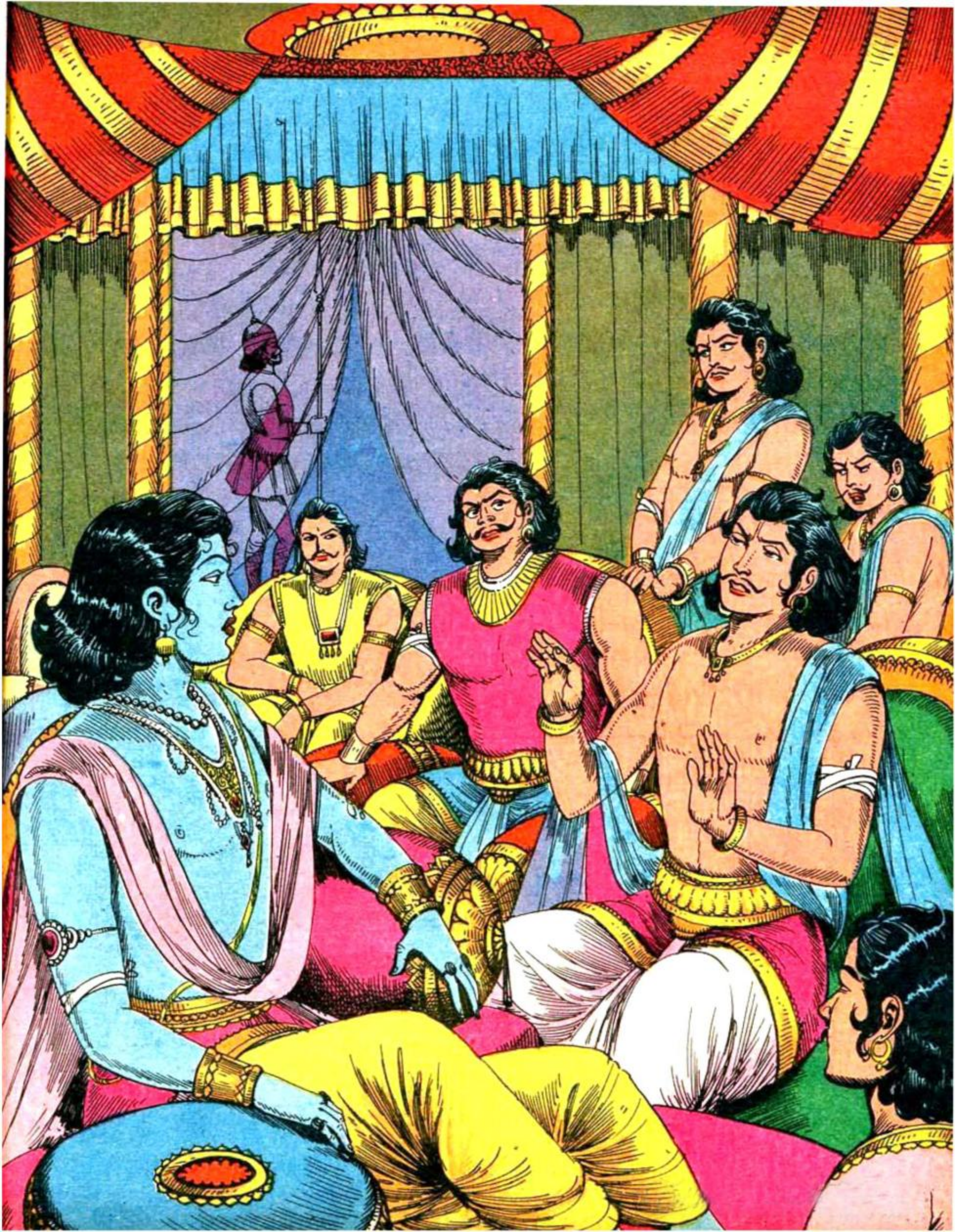

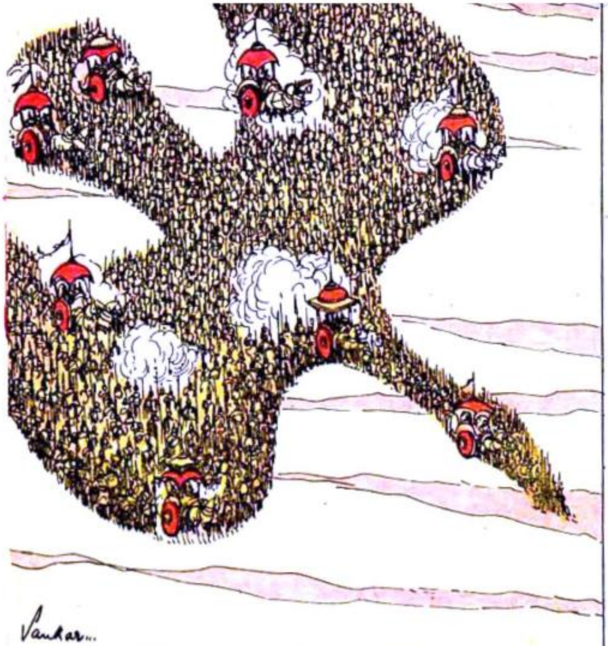

বধ করার জন্যই যে শিখণ্ডীর জন্ম হয়েছে সে কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয়।"

কৃষ্ণের এই কথা শুনে যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্নকে বললেন, "তুমি বাসুদেবের সমতুল্য যোদ্ধা, কার্তিকেয় যেমন দেবগণের সেনাপতি, সেরূপ তুমি আমাদের সেনা-পতি। পুরুষ শার্দুল, তুমি কৌরবগণকে সংহার কর, আমরা সকলে তোমার অনু-গমন করব।"

ধৃষ্টদ্যুম্ন এই কথা শুনে বললেন, "মহারাজ, মহাদেবের বিধান অনুযায়ী আমিই দ্রোণকে বধ করব। আমার জন্মই হয়েছে দ্রোণকে বধ করার উদ্দেশ্যে। আজ আমি ভীষ্ম, কৃপ, দ্রোণ, শল্য ও জয়দ্রথ প্রমুখ সকল যোদ্ধাদের সাথেই যুদ্ধ করব।"

"আমি শুনেছি ক্রৌঞ্চ ব্যূহ শত্রুনাশ করে। দেবতা ও রাক্ষসদের যুদ্ধের সময় ইন্দ্র বৃহস্পতিকে এই ব্যূহের কথা বলে ছিলেন। এই ব্যূহ রচনা করা সবাই ঠিক জানে না। কালকের যুদ্ধে আমাদের সেনা বাহিনীকে ক্রৌঞ্চব্যূহে দাঁড় করাও।" যুধিষ্ঠির বললেন।

যুধিষ্ঠিরের উপদেশ মত ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রৌঞ্চারুণ নামক ব্যূহ তৈরি করালেন। পাণ্ডবসেনারা ক্রৌঞ্চব্যূহে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ব্যূহের সামনের সারিতে দাঁড়ালেন অর্জুন তাঁর পরিচালনাধীন সেনাবাহিনী নিয়ে। তাঁর পিছনে দাঁড়ালেন দ্রুপদ। যুধিষ্ঠির পুচ্ছ-দেশে সেনা সাজিয়ে দাঁড়ালেন। ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রৌঞ্চব্যূহের পাখায় সসৈন্যে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

পাণ্ডবদের ক্রৌঞ্চব্যূহ দেখে ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্যোধন প্রমুখ বিকল্প এক ব্যূহ রচনা করে এক একজন এক এক অংশে সেনা সাজিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

পরের দিন আবার যুদ্ধ আরম্ভ হল। অভিমন্যু, ভীমসেন, সাত্যকি, কেকয়রাজ, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং চেদি ও মৎস্য

সেনার উপর ভীষ্মের শর বর্ষিত হতে লাগল। দুপক্ষের ব্যূহ যুদ্ধ চঞ্চল হয়ে উঠল। বহু রথসেনা পালিয়ে গেল। পাণ্ডবদের বেশ কিছু সৈন্য নিহত হল। এ দৃশ্য দেখে অর্জুন কৃষ্ণকে তাঁর রথ ভীষ্মের কাছে নিয়ে যেতে বললেন। ভীষ্মকে বধ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ভীষ্মের দিকে অর্জুনের রথ, অসংখ্য পতাকা শোভিত সেই শুভ্র রথ, বিদ্যুৎ গতিতে ভীষ্মের রথের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। পথে যত কৌরবসেনা পড়ল তাঁরা নিহত হলেন।

অর্জুনের হাতে এত কৌরব সেনাকে নিহত হতে দেখে দুর্যোধন শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তিনি ভীষ্মকে বললেন, "আপনি রথিশ্রেষ্ঠ আপনি থাকতে, দ্রোণ থাকতে আমাদের সেনা এইভাবে মৃত্যুবরণ করছে! আমি এই দৃশ্য সহ্য করতে পারছি না। আপনি অবিলম্বে এমন কিছু করুন যাতে অবিলম্বে অর্জুনের মৃত্যু ঘটানো যায়।"

দুর্যোধনের কথা শুনে ভীষ্ম হঠাৎ বলে উঠলেন, "ছিঃ, এ তোমার কি ধরণের ক্ষত্রধর্ম!"

তারপর ভীষ্ম অর্জুনের দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর শাঁখের আওয়াজে, রথ-চক্রের তীব্র গতির ফলে আকাশ বাতাস যেন কাঁপতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভীষ্মের পেছনে অসংখ্য কৌরবসেনা আর অর্জুনের পেছনে পাণ্ডবসেনা সমবেত হল। প্রচণ্ড যুদ্ধ উম্মাদনার সৃষ্টি হল।

তারপর ভীষ্ম ও অর্জুনের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে দুজনেরই রথ ভেঙ্গে গেল। সারথি আহত হল। অর্জুনের সারথি কৃষ্ণের গায়ে তিনটি তীর বিদ্ধ হল। কৃষ্ণকে আহত দেখে ভীষণ রেগে গিয়ে অর্জুন ভীষ্মের সারথির গায়ে তিনটি তীর বিদ্ধ করল। কিন্তু এই যুদ্ধে ভীষ্ম বা অর্জুন কেউ পরাজিত হননি।

সেই সময় যুদ্ধক্ষেত্রের অন্যান্য প্রান্তেও প্রচণ্ড যুদ্ধ হতে লাগল। ব্যক্তির বিরুদ্ধে

ব্যক্তির যুদ্ধ। ধৃষ্টদ্যুম্নের বিরুদ্ধে দ্রোণের যুদ্ধ। ধৃষ্টদ্যুম্নের যুদ্ধ কৌশল দেখে পাণ্ডব পক্ষের যোদ্ধারা আনন্দে সিংহনাদ করতে লাগল। দুজনের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলতে লাগল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন আর সামাল দিতে পারেন নি। তাঁকে পর্যুদস্ত হতে হলো।

ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিপর্যস্ত হতে দেখে ভীম তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে তাঁকে রক্ষা করতে লাগলেন।

ভীমকে এগিয়ে আসতে দেখে কলিঙ্গ-রাজ ও তাঁর সেনাবাহিনী ভীমকে বাধা দিতে এগিয়ে এলেন। তখন দ্রোণ ভীমকে ছেড়ে বিরাট ও দ্রুপদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এগিয়ে গেলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন অন্য একটি রথে বসে যুধিষ্ঠিরের কাছে গেলেন।

এদিকে ভীম বহু কৌরব সেনা বধ করছেন দেখে ভীষ্ম তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে গিয়ে শরাঘাতে ভীমের সমস্ত অশ্ব নষ্ট করে দিলেন। কলিঙ্গরাজ শ্রুতায়ু ও তাঁর পুত্র শক্রদেব ও ভানুমান ভীমকে বাধা দিতে এসে তাঁর হাতে নিহত হলেন। আক্রান্ত হয়ে ভীম ক্রোধান্বিত হয়ে ভীষ্মের সারথিকে বধ করলেন। ভীষ্মের রথের চারিটি অশ্ব রথ নিয়ে বায়ুবেগে রণভূমি থেকে চলে গেল। ভীম আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।

ভীষ্মের পালানোর এই দৃশ্য দেখে ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীষণ উৎসাহিত হলেন। তখন ভীমকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন তিনি মানুষ নন, কাল।

তারপর সাত্যকি ভীমের কাছে এসে তাঁর পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে বললেন, "বাঃ, ভীম সতিই তোমার প্রতাপের তুলনা নেই। তুমি একা কি করে পারলে রাজা কলিঙ্গ ও তাঁর পুত্রদের বধ করতে।" বলে উৎসাহে আনন্দে ভীমকে জড়িয়ে ধরলেন সাত্যকি।

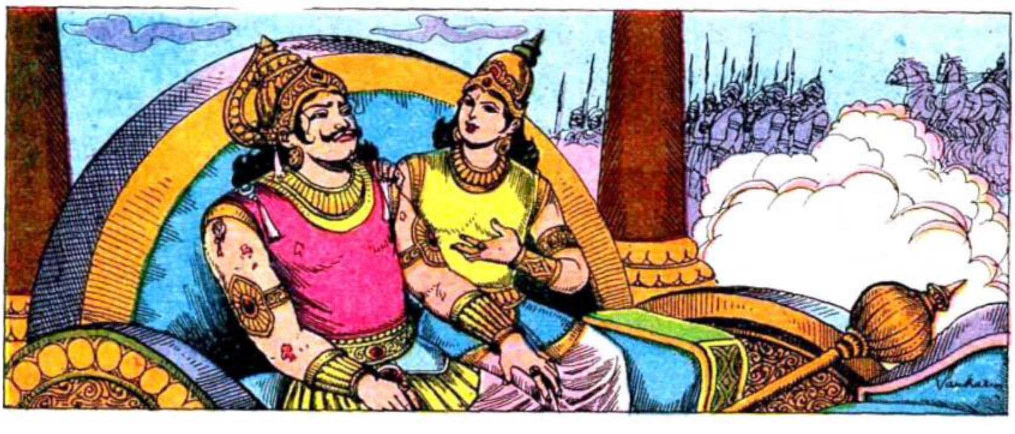

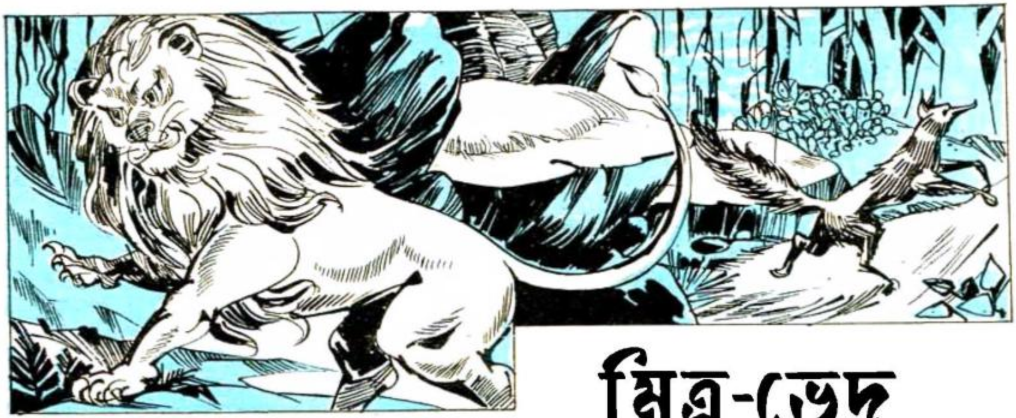

মিত্র-ভেদ

তিন

দমনকের কাছে শেয়ালের কাহিনী শুনে সিংহরাজ পিঙ্গলক বলল, "পরিবারের সবাই এই বন ছেড়ে পালাতে চাইছে।"

"মহারাজ, এর জন্য ওদের দায়ী করা যায় না। যেমন রাজা তেমন প্রজা। আপনি সাহস করে থাকলে আমি খোঁজ করে দেখব ঐ অদ্ভুত আওয়াজ কে করল। তার পর যা ভাল মনে করবেন তাই করতে পারেন!" দমনক বলল।

"দামী কথা বলেছ। কিন্তু তোমার সাহস দেখে আমি অবাক হচ্ছি।" পিঙ্গলক বলল।

"প্রভুর আজ্ঞানুসারে ভৃত্য যে কোন কাজের ঝুঁকি নিতে পারে। বিশ্বাসী ভৃত্য আগুন অথবা সমুদ্রে ঝাঁপ দিতেও দ্বিধা বোধ করবে না।" দমনক বলল।

"ঠিক আছে, তাহলে তুমি যাও। তোমার শুভ হোক।" পিঙ্গলক বলল।

তারপর দমনক পিঙ্গলককে প্রণাম করে ঐ রহস্য ধ্বনি যেদিক থেকে শোনা গিয়েছিল সেদিকে রওনা হয়ে গেল।

পিঙ্গলক মনে মনে ভাবল, "আমি যে ভীষণ ভয় পেয়েছি তা এর কাছে প্রকাশ করে ভুল করিনি তো? ঐ ভয়ঙ্কর জানোয়ারটাকে এনে আমাকে মেরে ফেলবে নাতো? দমনক তো কোন পদ পায়নি, সেই আক্রোশে সে যদি আমার কোন ক্ষতি করে বসে! এক কাজ করি, আমি

শেষ প্রচ্ছদ চিত্র

অন্য কোন জায়গায় লুকিয়ে অপেক্ষা করি।"

পিঙ্গলক আত্মরক্ষার জন্য একটা ভাল জায়গা বেছে নিয়ে লুকিয়ে ভাবতে লাগল, "বিশ্বাস করার ফলে বলবান দুর্বলের কাছে পরাজিত হয়। সাবধানী দুর্বল হয়েও সবলের কাছে পরাজিত হয় না।"

ইতিমধ্যে রম্ভাধ্বনি করা সঞ্জীবককে দেখে নিল দমনক। দমনক দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হল, ! এ যে এক সাধারণ বলদ! সে ভাবল, "এক কাজ করা যেতে পারে। একে পিঙ্গলক যখন এত ভয় করে তখন এই বলদের ভয় দেখিয়ে পিঙ্গলককে দমিয়ে রাখা যাবে। ভৃত্য সব সময় চায় যে প্রভু সমস্যা জর্জরিত থাক। তার সেই অবস্থার সুযোগে ভৃত্য কাজ গুছিয়ে নিতে পারে। সমস্যা না থাকলে রাজা পরামর্শের জন্য লোক রাখবে কেন? অসুখ না করলে কি আর কেউ বৈদ্যকে ডাকে?"

দমনক পিঙ্গলকের কাছে গেল। পিঙ্গলক তাকে জিজ্ঞেস করল, "কিহে, তুমি ঐ ভয়ঙ্কর জন্তুটাকে দেখতে পেয়েছ?"

"আপনার আশীর্বাদে দেখতে পেয়েছি। আপনার ক্ষমতা ও শক্তি সম্পর্কে সবিস্তারে তাকে জানিয়েছি। আমি এও বলেছি যে সে যেন আপনার অধীনতা স্বীকার করে। আপনাকে রাজা হিসেবে গ্রহণ করে। আশা করি তাকে আপনার পায়ের কাছে আনতে

পারব। তাকে নত করাতে পারব।" দমনক বলল। তার কথা শুনে পিঙ্গলক খুশী হয়ে বলল, "তাড়াতাড়ি তাকে নিয়ে এস।"

তারপর সে সঞ্জীবকের কাছে গিয়ে বলল, "ওরে এই খোঁড়া বলদ। তুমি এখানে রম্ভা ধ্বনি তুলে এখানকার শান্তি ভঙ্গ করছ কেন? চল আমাদের পিঙ্গলক রাজার কাছে। রাজা তোমার কাছে এই ধরণের খারাপ আচরণের জন্য কৈফিয়ত চাইবেন।"

"যে পিঙ্গলকের কথা বলছ সে কে বলত?" সঞ্জীবক জিজ্ঞেস করল।

"সে কি! আমাদের রাজা পিঙ্গলককে চেন না।" রাজার পরিচয় দিলে অবাক হয়ে যাবে। বুক ভয়ে কেঁপে উঠবে। সে যে মস্ত বড় এক সিংহ। এই বনের রাজা। সমস্ত জন্তু জানোয়ার তার অধীনে। বিরাট এক বটগাছের নিচে তার সভা বসে।" দমনক বিস্তারিতভাবে বলল।

একথা শুনে সঞ্জীবক বলল, "তুমিতো আচ্ছা, যার কাছে আমাকে নিয়ে যেতে চাইছ তোমার কর্তব্য হল তার সম্পর্কে আমার মনে একটা ভাল ধারণা ঢোকান। তুমি তার সম্পর্কে আমার মনে ভয়ের সঞ্চার করলে আমি যেতে চাইব কেন?"

"ঠিক বলেছ। তবে আমার রাজার মন বড়। তুমি এখানেই থাক। আমি আসছি।" বলে দমনক পিঙ্গলকের কাছে

গিয়ে বলল, "মহারাজ ওটা সাধারণ জানোয়ার নয়। বলে কিনা আমি শিবের নিজস্ব বাহন। শিবের অনুমতি অনুসারেই এই বনে চড়ে বেড়াচ্ছি।"

"একথা শুনে পিঙ্গলক ঘাবড়ে গিয়ে বলল, "আগেই জানতাম। শিবের অনুমতি না নিয়ে এই বনে কেউ ঢুকতেই পারে না। ঐ ভয়ঙ্কর আওয়াজ করা তো দূরের কথা। কোই তুমি তো আমাকে জানালে না ওকে কি বলেছ আমার সম্পর্কে ?"

"আমি তাকে বলেছি, আমার রাজা তো পার্বতীর নিজস্ব বাহন। পার্বতীই আমার রাজাকে এই বন দিয়ে দিয়েছেন। তুমি এখানে অতিথি হয়ে এসেছ। তুমি রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর। তারপর তুমি যত ইচ্ছা খাও দাও, যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়াও কেউ কোন কথা বলবে না। আমার কথা সে মেনে নিল বটে তবে সে আপনার কাছ থেকে অভয় চায়।" দমনক বলল।

পিঙ্গলক খুব খুশী হয়ে বলল, "বেশ ভাল কথা বলেছে। তাকে বলো যে আমি তাকে অভয় দিলাম। যাও, নিয়ে এস।"

সঞ্জীবককে আনতে যাওয়ার সময় দমনকের মনে খুব আনন্দ হচ্ছিল। সে ভাবল রাজা তাকে খুব সুনজরে দেখছে। দমনক সঞ্জীবকের কাছে গিয়ে বলল, "হে বন্ধু, আমি রাজার কাছ থেকে অভয় এনেছি। তুমি এখন কোন রকম ভয় বা দ্বিধা না করে চল আমার সঙ্গে। তবে একটা কথা মনে রেখ। আমি যা বলব সেই মত চলবে। মনে রেখ শিকার করার সময় একজন তাড়া করে ঠিক জায়গায় আনে আর অন্যজন সেই শিকার মারে। পরে দুজনে আধা আধি ভাগ করে নেয়। রাজার কর্মচারির কথা মত না চললে দন্তিলের মত তোমাকে অপমাণিত হতে হবে।"

"কি হবে ?" সঞ্জীবক জিজ্ঞেস করল। দমনক দন্তিলের কাহিনী বলা শুরু করল।

প্রাচীন চিত্র

খৃষ্টপূর্ব ১৪৯৫ অব্দে ঈজিপ্টের রাণী হাট্‌সেপস্থুট্‌ ধুনো-গাছ বিদেশ থেকে আনিয়ে নিজের দেশের মাটিতে পুঁতে দিতেন। তাঁর বাগানে ধুনো গাছ ভরে ছিল। তিবিসের কাছের মন্দিরের দেয়ালে তার চিত্র খোদিত আছে। এই চিত্র খৃষ্টপূর্ব ১৪৮৭ অব্দে খোদিত হয়েছিল। অর্থাৎ ৩৪৬০ বছরের আগে খোদাই করা চিত্র।

ফটো : ডি. এন. শির্কে

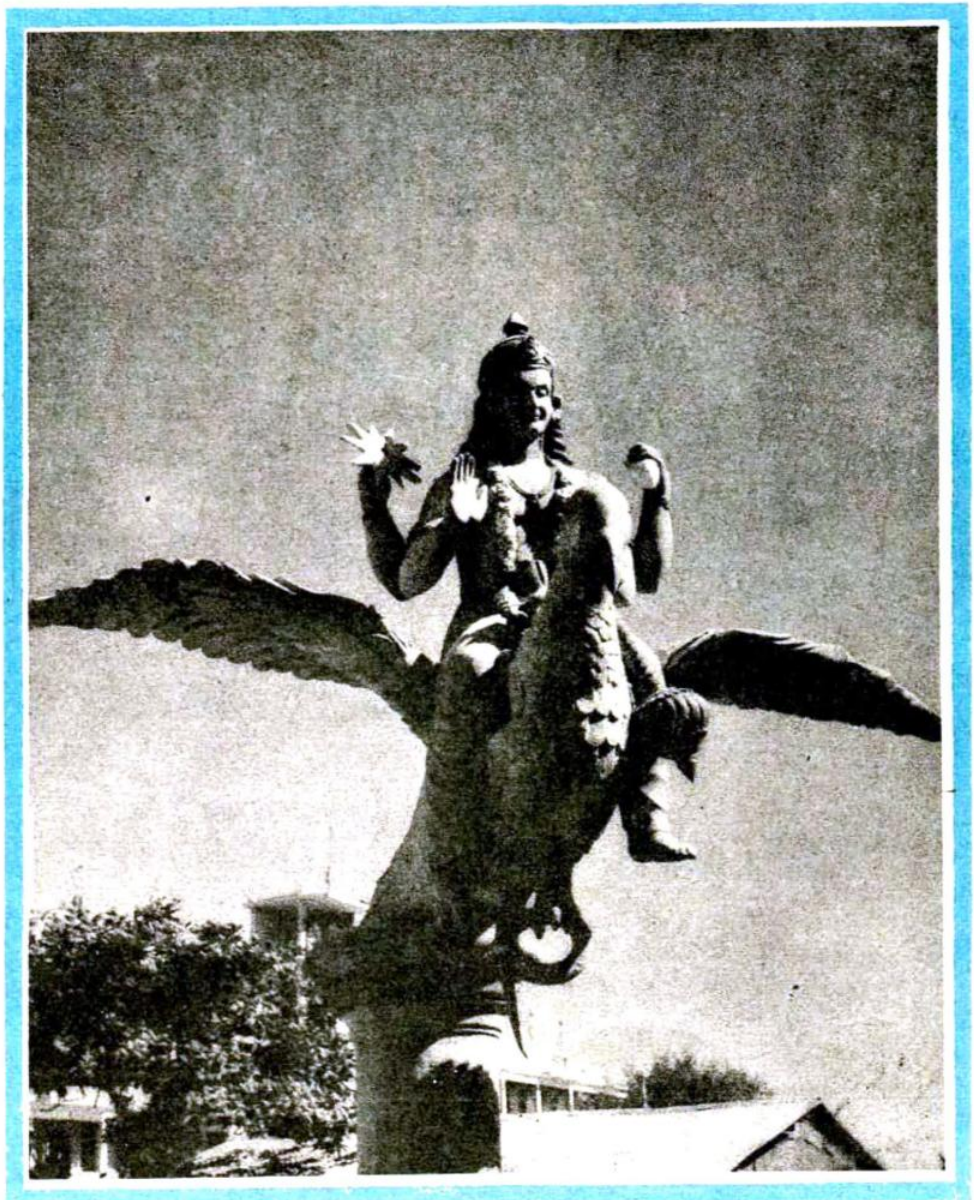

পুরস্কৃত
নাম

উড়ি পক্ষীরাজে চড়ি

পুরস্কার পেলেন
উৎপল চন্দ্র দাস

ফটো : ডি. এন. শির্কে

বলুহাটী
হাওড়া

বসি হাত জোড় করি

পুরস্কৃত
নাম

ফটো নামকরণ প্রতিযোগিতা ঃঃ পুরস্কার ২০ টাকা

★

* ফটো-নামকরণ ২০শে নভেম্বর '৭৩-এর মধ্যে পৌঁছানো চাই।
* ফটোর নামকরণ দু চারটি শব্দের মধ্যে হওয়া চাই এবং দুটো ফটোর নামকরণের মধ্যে ছন্দগত মিল থাকা চাই। নিচের ঠিকানায় পোস্ট-কার্ডেই লিখে পাঠাতে হবে। পুরস্কৃত নাম সহ বড় ফটো জানুয়ারী '৭৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

চাঁদমামা

এই সংখ্যার কয়েকটি গল্প-সম্ভার

সুন্দর স্বপ্ন	৭	যেমন কুকুর তেমনি মুগুর	৩৫
যক্ষপর্বত	৯	কালিদাসের গুরু	৩৯
বিজয় চিহ্ন	১৭	অপমানের বদলা	৪২
সাধনা	২৩	ঐতিহাসিক	৪৫
প্রতিশোধ	২৮	মহাভারত	৪৯
রূপমতীর বিবাহ	৩১	মিত্রভেদ	৫৭

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ চিত্র

বৌদ্ধ বিহার

তৃতীয় প্রচ্ছদ চিত্র

বাহারে বুদ্ধ

Printed by B. V. REDDI at The Prasad Process Private Ltd., and Published by B. VISWANATHA REDDI for Chandamama Publications, 2 & 3, Arcot Road, Madras-26. Controlling Editor: 'CHAKRAPANI'

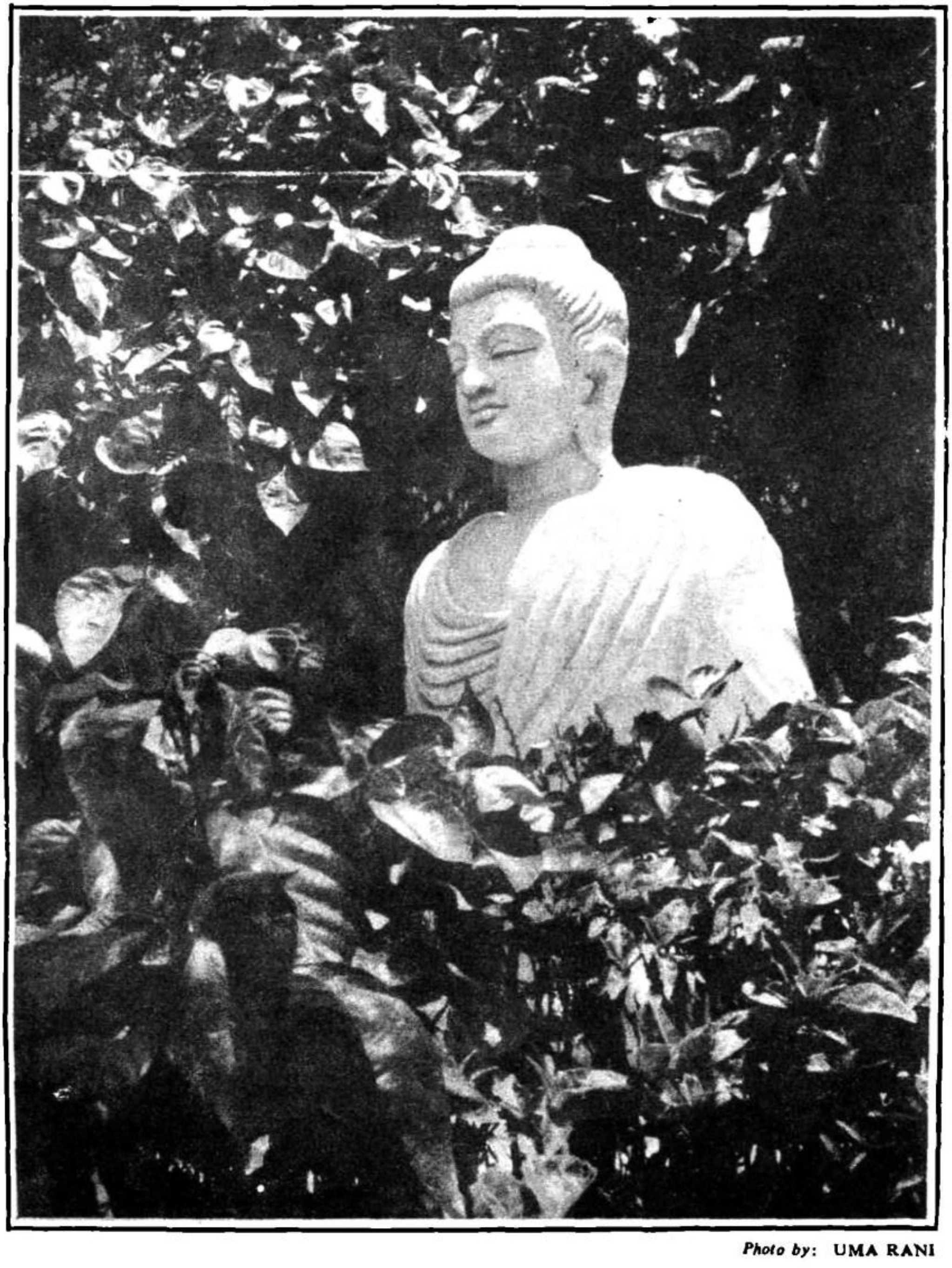

Photo by: UMA RANI

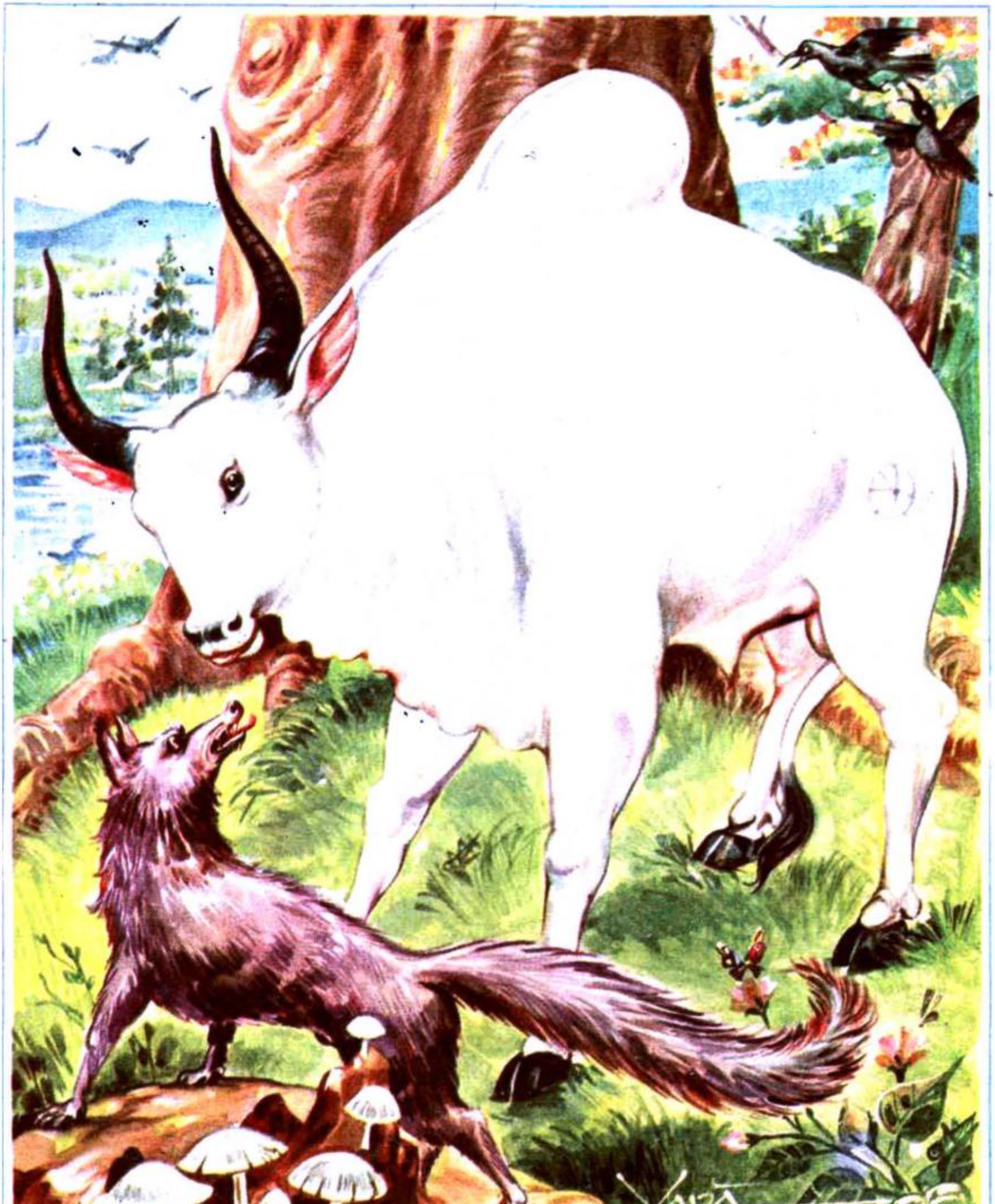

মিত্রভেদ